ত্রৈমাসিক

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ ৫ । সংখ্যা ১৮ । এপ্রিল-জুন ২০০৯

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান উপদেষ্টা

মাওলানা আবদুস সুবহান

সম্পাদক

আবদুল মান্নান তালিব

সহকারী সম্পাদক

মুহাম্মদ মূসা

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দিকা

প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী

প্রফেসর ড. আব্দুল মাবুদ

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ১৮

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : এপ্রিল-জুন ২০০৯

যোগাযোগ : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
৫৫/বি পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
সুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১৬০৫২৭
মোবাইল : ০১৭১৭ ২২০৪৯৮, ০১৯১৭-১৯১৩৯৩, ০১৯১৬-৫৯৪০৭৯
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
MSA ৮৮৭২
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স, ১৯৫ ফকিরাপুল (৩য় তলা), (১ম গলি) ঢাকা।

দাম : ৪০ টাকা US $ 3

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 40 US $ 3.

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	৫	
আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে কুরআনের মূলনীতি	৯	মওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী
রসূলুল্লাহ্ স.-এর যুগে ভূমি ব্যবস্থা	৩১	ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান
ইসলামী ফিকহের আলোকে কালক্ষেপণ	৬৩	মোহাঃ মঞ্জুরুল ইসলাম
যেনা-ব্যভিচার সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের বিধান ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি	৭৭	মুহাম্মদ মূসা
জন্ম নিবন্ধনের আইনগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপট : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	৯৩	নাহিদ ফেরদৌসী
ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ	১০১	ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান
মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মতামত	১২৩	আবুশিফা মুহাম্মদ শহীদ

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৮

সম্পাদকীয়

ইসলামী আইন সেক্যুলার আইনের তুলনায় অধিকতর অসাম্প্রদায়িক

কুরআন একটা জীবন বিধান, একটা সংবিধান, শুধু মুসলমানের জন্য নয়, সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য। এ সংবিধান আল্লাহ তৈরি করেছেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বাস্তব জীবন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এ প্রয়োগ কৌশল আল্লাহ তায়ালাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিখিয়েছেন। কুরআনে নবীর এ সংবিধান প্রয়োগ কৌশলকে বলা হয়েছে হিকমত। তাফসীরকারগণ হিকমতের অর্থ করেছেন সুন্নাত ও হাদীস। সুন্নাত ও হাদীস নবীর সমগ্র জীবনের কর্মকান্ড ও তাঁর বাণী। আর তাঁর সমস্ত কথা ও কাজ কুরআনী সংবিধানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই কুরআনের সাথে সাথে সুন্নাতও মুসলমানদের কাছে সমান পর্যায়ের হুজ্জাত তথা জীবন গঠনের প্রামাণ্য ভিত্তি।

অর্থাৎ কুরআনী বিধান এবং এ বিধান প্রয়োগের যে প্রাথমিক কৌশল নবী স. উদ্ভাবন করেছিলেন তারই ভিত্তিতে এ বিধান পরবর্তীকালে প্রযুক্ত হবে। তাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এবং সমস্যার বিভিন্নতার ফলে এ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হলেও নবীর প্রাথমিক প্রয়োগ কৌশলের মূলনীতির ভিত্তিতেই তা গড়ে ওঠে। নবুওয়াত পরবর্তীকালের এ প্রয়োগ কৌশলকে উসূলে ফিক্‌হ নামে অভিহিত করা হয়েছে। উসূলে ফিকহের ভিত্তিতে সারা ইসলামী বিশ্বে বিশাল ফিক্‌হ শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। তাই ফিক্‌হ হচ্ছে কুরআনী বিধান ও আইনের বিস্তৃত রূপায়ন।

নবুওয়াত পরবর্তী খিলাফত তথা খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী আইন প্রণয়ন এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের অবয়ব নির্মাণের কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। খলীফাগণ নিজেরাই ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ। পরবর্তী মুলুকিয়াত তথা রাজতান্ত্রিক শাসনামলে একমাত্র উমাইয়া শাসক আমীর মু'আবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইসলামী আইন প্রণয়নে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। ইসলামের এই প্রাথমিক যুগে মূলত

www.pathagar.com

বেসরকারী পর্যায়ে মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ ফিক্‌হ শাস্ত্রের উন্নয়ন ও ইসলামী আইন প্রণয়নের কাজ করেন।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর ইসলামী আইনের একটি সংকলন তৈরি করেন। উপমহাদেশে হিজরী একাদশ শতকে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর ফিক্‌হের উন্নয়ন এবং দেশের উপযোগী ইসলামী আইন প্রণয়নের কাজে সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যেখানে উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের শুরুতে কুত্‌বুদ্দীন আইবেক থেকে নিয়ে মোগল শাসনের শেষ অধ্যায়ে বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ বছরকালে একজন মুসলিম বাদশাহকে এ কাজে আগ্রহী দেখা যায়নি, সেখানে আওরঙ্গজেব নিজেই অগ্রণী হয়ে ফকীহ তথা ইসলামী বিশেষজ্ঞদের বোর্ড গঠন করে 'ফত্‌ওয়ায়ে আলমগীরী'র মতো একটি ইসলামী আইন গ্রন্থ সংকলন ও প্রণয়নের কাজে অংশগ্রহণ করেন। হিজরী একাদশ শতকে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের জন্য এটিই ছিল আইনগ্রন্থ। বাদশাহ আলমগীরের প্রেরণা, মনোভাব ও প্রচেষ্টার উৎস কোথায়?

এ বিষয়টি পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই আওরঙ্গজেব আলমগীরের শিক্ষকদের কথা আলোচনা করতে হয়। তাঁর মহামান্য শিক্ষকগণই তাঁকে মূলত এ পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। অবশ্য ইতিহাসগ্রন্থে আলমগীরের শিক্ষকদের তেমন কোনো বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য গ্রন্থাদি থেকে জানা যায়, তাঁর প্রথম শিক্ষক ছিলেন মওলানা আবদুল লতীফ সুলতানপুরী। মওলানা আবদুল লতীফ লাহোরী অবশ্য 'তাফসীর-এ-বাইদাবী'র টীকাকার হাশেম গীলানীর নামও উল্লেখ করেছেন। আদাবে আলমগীরী ও তুহ্‌ফাতুল কেরাম গ্রন্থদ্বয়ে মুল্লা মোহন বিহারীকে আলমগীরের উস্তাদ বলে দাবী করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সমকালীন শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক বৈশিষ্ট সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ বাদশাহ শাহজাহানের প্রধানমন্ত্রী আল্লামা সা'দুল্লাহ খানও ছিলেন আওরঙ্গজেবের শিক্ষক। এদের সবার প্রতিভা, জ্ঞান ও প্রেরণা আলমগীরকে উদ্বুদ্ধ করে।

আওরঙ্গজেব কুরআনের হাফেজ ছিলেন। ১০৭০ হিজরীতে তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি কুরআনের হিফজ শুরু করেন এবং সকল রাজকীয় দায়িত্ব পালন ও ব্যস্ততম জীবন যাপন করা সত্ত্বেও মাত্র এক বছরে সমগ্র কুরআন কণ্ঠস্থ করে ফেলেন।

মা'আসিরে আলমগীরীর লেখক মুহাম্মদ সাকী মাসআদ খান আলমগীরের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে লিখছেন ঃ দীনী ইলম তথা তাফসীর, হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন ছিল বাদশাহ জাহাঁপনার শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্ব। বাদশাহ হযরত ইমাম গাযালীর রচনাবলী, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর পত্রাবলী ও শায়খ কুত্‌বুদ্দীন শিরাজীর গ্রন্থাবলীর প্রতি বেশী আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ গদ্য রচয়িতা। কবিতার প্রতিও তাঁর আকর্ষণ কম ছিল না। কিন্তু উপদেশমূলক কবিতাই তিনি পছন্দ করতেন। কবিতায় মিথ্যা প্রশংসা ও স্তুতি ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয়।

www.pathagar.com

সিংহাসনে আরোহণ করার পরপরই আলমগীর জনগণের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সাধনের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন গঠন করেন। এর একটি ছিল আইন কমিশন ও দ্বিতীয়টি শিক্ষা কমিশন। শিক্ষা কমিশন আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় নয়। আজ বিশেষ করে আইন কমিশনের ওপর আলোচনা করতে চাই।

১৬৬৪ সালে তিনি এ আইন কমিশন গঠন করেন। এটি ছিল তাঁর-সিংহাসন আরোহণের ষষ্ঠ বছর। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ছেচল্লিশ বছর। এ আইন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তিনি 'ফিকহ্ শাস্ত্রে'র এমন একটি কিতাব তৈরি করতে চাচ্ছিলেন, যার ভিত্তি হবে হানাফী ফিকহ এবং যা দেশের জনগণের ব্যক্তিগত, সামাজিক, ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিশৃঙ্খলা দূর করে তাদের একমুখী ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে সাহায্য করবে। সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা শত শত আদালত ও কোর্ট কাছারীর কাজী ও বিচারকগণ এর সাহায্যে সঠিক রায় প্রদান করতে সক্ষম হবেন। এর ফলে সারাদেশের বিচারকগণের রায়ের মধ্যে একটা ঐক্য সৃষ্টি হবে, যা জনগণের জীবনকে একাত্ম করতে সাহায্য করবে। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করা যায় যে, দেশের বেশির ভাগ মুসলমান হানাফী তাই আইন প্রণয়ন করার পরও প্রয়োজনে অন্য ফিকহের ভিত্তিতে রায় দেয়ার সুযোগ কাযী তথা বিচারকদের থাকে। কারণ এই ফিক্হী মযহাবগুলোর মূল শক্তি হচ্ছে তাদের যুক্তি ও যুক্তির ভিত্তি। রায় যতক্ষণ গৃহীত না হয় ততক্ষণ রায় হিসাবেই থেকে যায়। কিন্তু যুক্তির ভিত্তিতে গৃহীত ও প্রযুক্ত হবার পরই এগুলো আইনে পরিণত হয়। এ সময় হিন্দুস্তানে একশ তিনটির মতো ফিকহ্ গ্রন্থের প্রচলন ছিল। সহজেই অনুমান করা যায়, এতগুলো গ্রন্থের আলোচনার ভিত্তিতে পেশোয়ার বরং কান্দাহার থেকে চট্টগ্রাম ও আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় কোনো একমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না।

শায়খ নিজাম উদ্দীন বুরহানপুরীকে বাদশাহ্ আইন কমিশনের প্রধান নিযুক্ত করেন। আলমগীরনামার লেখক শায়খ নিজাম উদ্দীনকে সমকালীন আলেমদের মধ্যমণি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আইন-আদালতের বিচারকবৃন্দ ও কমিশনের প্রধান ও সদস্যগণকে যেমন আজকের সভ্য জগতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রভাবমুক্ত রাখা হয়, তেমনি আওরঙ্গজেবও ইসলামের অতীত ট্রাডিশন অনুষায়ী আইন কমিশনকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতামুক্ত রেখেছিলেন। এ কমিশনের আরো চারজন সদস্য ছিলেন। তাঁরাও ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ ও খ্যাতিমান আলেম ও ফকীহ। তাঁরা হলেন ঃ এক. এলাহাবাদের কাজী মুহাম্মদ হুসাইন জৌনপুরী। দুই. শায়খ অজীহ উদ্দীন হারদুইয়ী। তিন. বাইদাবীর টীকাকার মুল্লা হামেদ জৌনপুরী। চার. লাহোর প্রদেশের প্রধান বিচারপতি মুল্লা মুহাম্মদ আকরম লাহোরী। এদেরকে সাহায্য করার জন্য আরো দশজন বিশেষজ্ঞ আলেম ও ফকীহকে নিযুক্ত করা হয়। সারাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচন করে তাদেরকে রাজধানীতে আনা হয়। শায়খ নিজাম এবং হযরত শাহ

www.pathagar.com

অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর পিতা শায়খ আবদুর রহীমের ওপর সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তায়। বাদশাহ নিজেও এ সম্পাদনা কাজে সহায়তা করতে থাকেন।

এ মহান কাজটি সম্পাদন করতে তৎকালীন মুদ্রার হিসাবে দুই লাখ টাকা ব্যয় হয়। এটা এমন এক সময়ের কথা যখন বাংলায় এক টাকায় নয় মণ চাল পাওয়া যেতো। অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশী মুদ্রায় এর মূল্য দাঁড়ায় একশ কোটিরও বেশী।

বাদশাহ আলমগীর কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে আইনের একটি শ্রেষ্ঠ কিতাব রচনা করেই ক্ষান্ত হননি বরং এই সঙ্গে তিনি ন্যায়বিচারের সুবিধার জন্য আদালতকে বিপুল ক্ষমতাও দান করেন। তিনি সারাদেশে ঘোষণা করে দেন, দেশের যে কোনো ব্যক্তি সরকার, সরকারী প্রশাসন এবং এমন কি খোদ বাদশাহর বিরুদ্ধেও নিজের অধিকার লাভের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবে। মোগল সালতানাতের অধীন সমস্ত সুবায় সরকারের পক্ষ থেকে আইনগত পরামর্শদাতা হিসেবে উকিল নিযুক্ত করা হয়। জনগণ তাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে আইনগত পরামর্শ ও সাহায্য লাভ করতো। উকিলগণ সরকার থেকে ভাতা লাভ করতেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম সমাজের অধিকার রক্ষা করেই বাদশাহ আলমগীর ইসলামী আইনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা দেখিয়েছেন। মোগল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান আওরঙ্গজেব আলমগীর দেশে এই আইনগত সংস্কার সাধন করেন এমন এক সময়ে যখন তাঁর শাসনভুক্ত এলাকার মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। বরং রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও তারা ছিল ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। তাছাড়া ইতিপূর্বে একশ' বছর আগে আকবরী শাসন আমলে ইসলামী আইনের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করা হয়। দেশের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। তাদের ধর্মীয় জীবনের ওপর বলপ্রয়োগের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ অবস্থায় আওরঙ্গজেব তাঁর এই আইনগত সংস্কার সাধনের মাধ্যমে জনগণের জীবনে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের ধর্মীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করার কোনো প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। আবার তাদের প্রতি অবিচার হবার ভয়ে দেশে কোনো সেক্যুলার আইনও জারি করা হয়নি। অর্থাৎ ইসলামী আইনের মধ্যে এমন ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে যা অমুসলিম সমাজকে কোনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না করে তাদের জাগতিক ও বৈষয়িক সমস্ত চাহিদা পূরণ এবং অধিকার দান করতে পারে এবং যে কোনো সেক্যুলার আইনের তুলনায় অধিকতর যোগ্যতার সাথে করতে পারে।

– আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৮, পৃষ্ঠা ঃ ৯-৩০

আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে কুরআনের মূলনীতি

মওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী

কুরআন মজীদের প্রাণসত্তা ও মূলনীতিগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যায়, আইনের এই উৎসটি আইন প্রণয়নের ব্যাপারে মানবিক স্বভাব-প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত নীতিগুলোর বিবেচনা অপরিহার্য গণ্য করেছে ঃ

এক. সংকীর্ণতা বর্জন (عدم حرج)

দুই. কষ্টের স্বল্পতা (قلت تكلف)

তিন. পর্যায়ক্রমিকতা (تدريج)

চার. নস্‌খ (نسخ)

পাঁচ. শানে-এ-নুযুল (شان نزول)

ছয়. হিকমত ওইল্লত (حكمة وعلت)

সাত. আরবের সামাজিক অবস্থা (معاشرتى حالت)

সংকীর্ণতা বর্জন

হযরত ইবনে 'আব্বাস রা. এবং হযরত 'আয়েশা রা. حرج হার্‌জ-এর মানে করেছেন ضيق সংকীর্ণতা ও সংকুচিত অবস্থা।[১] অর্থাৎ আইন এমন হতে হবে যা সহজসাধ্য, তাতে এমন কাঠিন্য থাকবে না যা মানুষের সহ্য সীমার বাইরে অথচ তার কোনো সংগত সমাধান থাকে না। এই নীতির সমর্থন পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

'তোমাদের জন্য আল্লাহ তার দীনকে সহজ করতে চান, কষ্টসাধ্য করতে চান না।'

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

'আল্লাহ্ দীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।'

লেখক ঃ পাকিস্তানের খ্যাতিমান গবেষক, আলেম। ওআইসির কেন্দ্রীয় ফিকহ একাডেমীর সদস্য।

www.pathagar.com

مَايُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

'আল্লাহ্ তোমাদের কোনো কঠিন অবস্থায় ফেলে দিতে চান না বরং তোমাদেরকে পাক পবিত্র করাই তাঁর উদ্দেশ্য।'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রা. ও হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা.-কে শাসন দায়িত্ব অর্পণ করতে গিয়ে তাঁদের দুজনকে সম্বোধন করেন বলেন ঃ

يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَاوَ بَشِّرا وَ لاَ تُنَفِّرَاوَ تَطَا وَعَا وَ لاَ تَخْتَلِفَا

'তোমরা মানুষের জন্য তাদের কর্মকে সহজ করো, কঠিন করো না। উৎসাহ দান করো, ঘৃণার উদ্রেক করো না। মতৈক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে, বিরোধ সৃষ্টি করো না।'[২] আর একবার তিনি বলেন ঃ

بُعِثْتُ بِالْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ

'আমাকে সরল- সোজা (Straight forward) সহনশীল শরীয়ত দিয়ে পাঠানো হয়েছে।'[৩] এ সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَى اللّٰهِ الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَةُ

'আল্লাহর কাছে পসন্দনীয় হচ্ছে সহজ- সোজা সহনশীল দীন।'[৪]
আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِى الإِسْلاَمِ

'ইসলামে ক্ষতি নেই, ক্ষতিগ্রস্ত করার অবকাশও নেই।' মিসওয়াক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلى اُمَّتِى لاَمَرْتُهُمْ بِالسواك عِنْدَ كُلِّ صَلوةٍ

'যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে এ ভয় আমার না থাকতো তাহলে আমি প্রত্যেক নামাযের সময় তাদের মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম।'[৫]
কা'বার একটি অংশকে (হাতীম) কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত 'আয়েশা রা.-কে যা বলেন তাতে দেখা যায়, জনগণের মধ্যে সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রতি হযরতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ঃ

ولاحدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على اساس ابراهيم

www.pathagar.com

"যদি তোমার কওমের সবেমাত্র কুফরী থেকে ইসলামে প্রবেশ করার ব্যাপারটি না হতো তাহলে আমি কা'বাকে ভেঙে ইবরাহিমী ভিতের ওপর নির্মাণ করতাম (এবং হাতীমকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করতাম, যদি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকতো।)[৬]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সাধারণ রীতি ছিল যখন তাঁকে দুটি জিনিসের মধ্য থেকে একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেয়া হতো, তিনি অধিকতর সহজটি গ্রহণ করতেন। যদি তার সাথে গুনাহ বিজড়িত না হতো।[৭]

ومايـر بـيـن شـيـئـين الا اخـتـار الـيـسر هما مالم يكن اثـما

এই বিস্তারিত আলোচনার অর্থ এ নয় যে, শরীয়তের বিধি-নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে মামুলি ধরনের কষ্টও বরদাশত করার অবকাশ নেই। অথবা কোনো কঠিন সংকট ও সংকীর্ণ অবস্থার মুখোমুখি হলে তা উত্তরণের ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং তার যথোপযোগী সমাধানের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার নির্দেশ থাকে না। مكلف بالشرع অর্থাৎ শরীয়তের দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার কোনো অর্থই থাকে না।

দ্বিতীয় মূলনীতি ঃ কষ্টের স্বল্পতা

এটা সংকীর্ণতা বর্জনের নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কারণ আইনে যে পরিমাণ সংকীর্ণতা থাকবে ঠিক সেই পরিমাণ কষ্টও বেড়ে যাবে।

নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে এই নীতিটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا

'আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সামর্থের বেশী দায়িত্ব চাপান না।'

মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ মানুষকে তার শক্তি অনুযায়ী অর্থাৎ যতটুকু সে সহজে বরদাশত করতে পারে সে পরিমাণ দায়িত্ব চাপান, এমন নয় যাতে নিঃশেষে সর্ব শক্তি ব্যয় করতে হয়।[৮]

আর একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

'আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান, (আসলে) মানুষকে (প্রকৃতি গতভাবে) দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নুবুওয়ত দানের অন্যতম উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে গিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَغْلَلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

www.pathagar.com

রসূল তাদের বোঝা নামিয়ে দেন এবং শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন তাদেরকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ তাদের ওপর যে সব কঠিন ব্যবস্থা চাপান হয়েছিল এবং যাজক শ্রেণী তাদেরকে যে সব শেকলে আবদ্ধ করেছিল মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে তাদের রেহাই দেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ

'হে ঈমানদারগণ তোমরা নানা ব্যাপারে (রসূল)-কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করোনা। (তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে) যদি তোমাদের কাছে সব কিছু প্রকাশ করে দেয়া হয় তাহলে তোমরা মুশকিলে পড়বে (দীন তোমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হবে)। যদি কুরআন নাযিলের সময় তোমরা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করো তাহলে তোমাদের কাছে সে সব প্রশ্নের উত্তরও প্রকাশ করে দেয়া হবে। তাতে দীনে জটিলতা সৃষ্টি হবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নলিখিত উক্তি থেকে উল্লেখিত মূলনীতির প্রতি তার শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার তিনি বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّقُوْهَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَمَكَثَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَّكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَسُوْا عَنْهَا-

"আল্লাহ কতকগুলো ফরয নির্ধারিত করে দিয়েছেন, সেগুলো নষ্ট (অমান্য) করেনো। কতগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেগুলো অতিক্রম করো না। কতগুলো জিনিস হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোর ব্যতিক্রম করো না। আর যে বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্মৃতি ছাড়াই, নিরবতা অবলম্বন করেছেন তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করার জন্য সেগুলো সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ো না, তাতে দীনের মধ্যে অনাহুত জটিলতা সৃষ্টি হবে।[৯]

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে উম্মতকে সাবধান করতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ-

'তোমাদের আগে যারা ছিল তারা অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং নবীদের সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি করে ধ্বংস হয়ে গেছে।'[১০]

তিনি আরো বলেন ঃ

www.pathagar.com

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدًا إِلاَّ غَلَبَهُ-

দীন হচ্ছে সহজ। কিন্তু যে ব্যক্তি দীনে জটিলতা সৃষ্টি করে, দীন তাকে পরাভূত করে।[১১]
উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা জানা যায় যে, শরীয়তের বিধি বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সহজসাধ্যতার নীতি অবলম্বন করেছেন।

তৃতীয় মূলনীতি ঃ পর্যায়ক্রম

কুরআনী বিধানসমূহ ২৩ বছর সময়কালে অবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়। প্রথম দিকের বিধানসমূহ 'আকীদা-বিশ্বাস' ও ইবাদত-বন্দেগীর সাথে সম্পর্কিত ছিল। পরে অবতীর্ণ বিধানগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পারিবারিক, সামাজিক, তমদ্দুনিক এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি। আকাইদ শিক্ষা ও ইবাদাত অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যতই সুগঠিত হতে থেকেছে এবং মানুষের গ্রহণ ক্ষমতা ও সহনশীলতা যতই বেড়েছে ততই সেই অনুপাতে তার জন্য তেমন খাদ্যের ব্যবস্থাও হয়েছে। যেমন প্রথম দিকে শিশুর জন্য শুধু তরল দুধের ব্যবস্থা করা হয়। পরে ক্রমে ক্রমে অধিকতর পুষ্টিকর অথচ গুরুপাক নয় এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়, শারীরিক চাহিদা ও হজম শক্তির বিবেচনায়। তেমনি শরীয়তের আদেশ- নিষেধও পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে।
অনুরূপভাবে শরীয়তের আহ্কাম এমনকি নামায-রোযা যাকাত, হজ্জ ইত্যাদির আদেশসমূহ এবং মদ, ব্যভিচার, জুয়া ইত্যাদি নিষেধমূলক বিধানসমূহের ক্ষেত্রেও এই পর্যায়ক্রমিকতার নীতি অবলম্বিত হয়েছে।
উপরোল্লিখিত নীতি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিধানদাতাদের মধ্যে একটি মানসিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে, আর তা হচ্ছে এই যে, সমাজবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলা, কল্যাণ ও শান্তির গরজে আইনের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং মানুষের সহজাত ও অভিজ্ঞতা প্রসূত শান্তি প্রবণতা এবং কল্যাণকামিতা থেকেই আইনের উদ্ভব হয়। আর সেই আইনই সফল হয় যা মানুষের প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতাজাত প্রবণতাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রাখে।
মানুষের পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলামের আহ্কাম প্রবর্তনের মূলে এই যে পর্যায়-ক্রমিকতা প্রীতি তাও পরিপূর্ণতার দাবিদার এবং সহায়ক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِّنَ الْكَرَامَةِ وَالْبِرِّ إِلاَّ أَعْطَاهُ هٰذِهِ الأُمَّةَ وَمِنْ كَرَامَتِهِ وَإِحْسَانِهِ أَنَّهُ لَمْ يُوْجِبْ عَلَيْهِمُ الشَّرَائِعَ دَفْعَةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ-

www.pathagar.com

'মর্যাদা ও কল্যাণের হেন বস্তু নেই যা আল্লাহ এই উম্মতকে দান করেননি। শরীয়ত ব্যবস্থা (বিধি-বিধান) তিনি একই সঙ্গে নাযিল করেননি বরং পর্যায়ক্রমে একেরপর এক ওয়াজিব করেছেন, এটিও আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী।'[১২]

এই প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রা.-এর নিম্নলিখিত বাক্যগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ঃ

انما نزل اول ما نزل منه سُورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناسُ الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل اول شئ لاتشربوا الخمر لقالوا لاندع الخمر ابدا ولونزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابداً-

'প্রথমে মুফাস্‌সাল (مفصل) সূরাগুলো (সূরা হুজুরাত থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত) নাযিল হয়। সেগুলোতে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা রয়েছে। তারপর লোকেরা যখন ইসলামের দিকে এগিয়ে এলো তখন হালাল ও হারামের বিধানগুলো নাযিল হয়। যদি মদ্য পান নিষিদ্ধের বিধানটি প্রথম দিন নাযিল হতো তাহলে লোকেরা বলতো, আমরা কখনো মদ ছাড়বো না। অনুরূপভাবে প্রথম দিনই যিনা হারাম হবার বিধান নাযিল হলে লোকেরা বলে উঠতো, আমরা কখনো যিনা থেকে বিরত হবো না।'[১৩]

আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব পর্যায়ক্রমিক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর। তাছাড়া শুরুতে আইনের সংখ্যা কম হওয়া উচিত, যাতে সহজে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং তা বাস্তবে মেনে চলার ক্ষেত্রে বেশি সমস্যা ও সংকটের সৃষ্টি না হয়। বাস্তব জীবনে আইনের রূপায়ণের দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং মানুষকে আইনানুগ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীরা তা করেছিলেন সবিশেষ নিষ্ঠার সাথে।

চতুর্থ মূলনীতি ঃ নাস্‌খ

نسخ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ মুছে ফেলা, রহিত করা, কপি করা। ফিক্‌হের পরিভাষায় নস্‌খের দুটি অর্থ ঃ

এক. প্রথম হুকুমটি পরবর্তী হুকুমটির দ্বারা রহিত হয়ে যাবে।

দুই. অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রথম হুকুমটিতে কোনো প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হবে। অর্থাৎ প্রথম হুকুমটি যদি 'আম' তথা ব্যাপক হয়, তাহলে 'খাস' তথা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করতে হবে। মূতলাক (مطلق=নিঃশর্ত absolute) হলে তা মুকায়্যিদ (مقيد শর্ত সাপেক্ষ) হয়ে যাবে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথম হুকুমটিকে সীমিত অর্থে গ্রহণ এবং প্রয়োগ করাই হচ্ছে দ্বিতীয়

www.pathagar.com

প্রকার নাস্‌খ। শরীয়তের প্রথম প্রকারের নাস্‌খ-এর সম্পর্ক পূর্ববর্তী নবীদের সাথে, যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْنُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْمِثْلِهَا-

'আমি (আল্লাহ) যে আয়াত নাকচ করি অথবা ভুলিয়ে দিই, তার চাইতে উত্তম বা সমতুল্য আয়াত তদস্থলে নাযিল করি।'[১৪] উল্লেখ্য পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তে মানসূখ (منسوخ রহিত) হয়েছে বললে বুঝতে হবে মৌলিক আকায়েদ যথা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি এবং মুখ্য আহকাম যথা সালাত, সাওম, যাকাত ইত্যাদি বাদে অন্যান্য আহকাম রহিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রতিফলিত হয়েছে আবূ বাক্‌র জাস্‌সাস র. এর নিম্নোক্ত কথায় ঃ

انما ذكُر فيها من النسخ فانما المراد به نسخ شرائع الانبياء والمتقدمين-

'এই আয়াতে যে নস্‌খের কথা বলা হয়েছে তাতে পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়ত মান্‌সুখ (منسوخ নাকচ) হবার কথা বুঝানো হয়েছে।'[১৫]
আবূ মুসলিম ইসফাহানী র. (মৃত্যু ৩২২ হি.) এই মতটিই পোষণ করেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে কুরআন হাকীমের যে আয়াতগুলোকে অনেকে মানসূখ গণ্য করেছেন, সেগুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে আবূ মুসলিমের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি তাঁর উক্তিতে কুরআনের আয়াত 'মানসূখ' না হবার মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম রাযী এ প্রসঙ্গে আবূ মুসলিম বর্ণিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে ইমাম সাহেবের মতও যে মানসূখ না হবার দিকে তা বুঝা যায়।

কুরআন হাকীমে নাস্‌খ

দ্বিতীয় প্রকারের নাস্‌খের সম্পর্ক শরীয়তে মুহাম্মদীয়ার সাথে। কিন্তু এই নাস্‌খের অর্থ আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ নির্ধারণ। ফকীহগণের মতে এই নাস্‌খের অর্থ 'বয়ান' (বর্ণনা বা ব্যাখ্যা) হতে কোন আয়াতের হুকুম একেবারে নাকচ বা রহিত হওয়া বোঝায় না। এ প্রসঙ্গে 'উলামা-এ সালাফ' (علماء سلف পূর্ববর্তী যুগের আলেমগণ)-এর মত হচ্ছে—

هورفع الظاهر لتخصيص اوتقييد او شرط اومانع فهذا اكثر من السلف يسميه نسخا

(নাস্‌খ হয়) দৃশ্যমান (শাব্দিক) অর্থের বর্জন تخصيص বা সীমিতকরণের দরুণ কিংবা تقييد বা শর্তারোপের মাধ্যমে অথবা مانع বা প্রতিবন্ধকতার কারণে। এটিই উলামা-ই সালাফের অধিক সংখ্যকের মতে নসখ নামে অভিহিত।[১৬]

www.pathagar.com

'আল্লামা ইবনে কাইয়িম র. ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন ঃ

ومن عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحم بجملة نارة وهواصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة أمابتخصيص اوتقييد اوحمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبينه حتى انهم يسمون الاستثناء والشبرط والصغة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد بغيرذلك بل بامرخارج عنه-

"প্রথম যুগের আলেমগণের (سلف) অধিকাংশই 'নাসেখ ও মানসূখ' বলতে কখনো পুরোপুরি নস্‌খ তথা বাতিল হওয়া বুঝাতেন; মুতাআখ্‌খিরীন (متاخرين=সাহাবা ও তাবেঈদের পরবর্তী যুগের আলেমগণের মতে এটিই ছিল নাসখের পরিভাষার অর্থ। আবার কখনো তারা 'আম' (সর্বজনীন অর্থে), 'মুত্‌লাক' (সাধারণভাবে যেকোনোটি অর্থে) প্রকাশ ইত্যাদি অর্থের বিযুক্তিকরণ বুঝাতেন। এর কয়েকটি আকার আছে। যেমন 'আম'কে 'খাস' (বিশেষিত) করা, 'মুতলাককে মুকাইয়েদ (একটির মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেবার অর্থে) করা অথবা 'মুতলাক' থেকে 'মুকাইয়েদের' অর্থই গ্রহণ করা, তাফসীর করা, সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করা, এমন কি পৃথকীকরণ, শর্ত ও গুণগত অর্থ বর্ণনা করাকেও তাঁরা 'নস্‌খ' বলতেন। কারণ এসবই বাহ্যিক অর্থের বিযুক্তিকরণ এবং প্রকাশ্য ছাড়া বরং তা থেকে আলাদা হয়ে মূল উদ্দেশ্য বর্ণনার সাথে সংযুক্ত।[১৭]

যেহেতু কুরআনী বিধানসমূহ সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে ২৩ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে সুতরাং পরিবেশ ও পরিস্থিতির অজুহাতে কোনো বিধানকে পুরোপুরি বাতিল করে দেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এক্ষেত্রে অবস্থা ও চাহিদার বিবেচনায়, অথচ শরীয়তের রূহ মৌল (প্রাণসত্তা) ও উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন রেখে কোন বিধানকে সম্প্রসারিত করা বা তার ব্যাপকতা খর্ব করা অথবা অনুরূপ প্রায়োগিক ব্যবস্থা করাই হবে নাসখের উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থাতে রয়েছে ইসলামী ফিকহের বিবর্তন এবং যুগোপযোগিতা যা তাকে প্রতি যুগে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করার ক্ষমতায় উন্নীত করেছে। এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ অলিউল্লাহ র.-এর একটি ব্যাখ্যা বিশেষ প্রনিধান যোগ্য। তিনি বলেন ঃ

والثاني ان يكون شيى مظنة مصلحة اومفسده فيحكم عليه حسب ذلك ثم يأتى زمان لايكون فيه مظنة لها فيتغير الحكم-

'দ্বিতীয় (প্রকার নস্‌খটি) হচ্ছে সম্ভাব্য কল্যাণের আশা বা ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে তদনুযায়ী বিধান দান করা, পরবর্তী কালে যখন সে সম্ভাবনা না থাকে তখন বিধান পাল্টে দেওয়া।'[১৮]

www.pathagar.com

একে প্রকৃত নস্‌খ বলা যায় না। যে সামাজিক অবস্থার কারণে কোনো বিধানের ব্যাপকতা সীমিত করা হলো বা অন্যত্র কোন পদ্ধতিতে নাস্‌খ করা হলো, সে অবস্থার অবসান হয়ে যদি পূর্বের অবস্থা ফিরে আসে, তখন বিধানের ব্যাপকতা বা পূর্বাবস্থাও ফিরে আসবে, কিন্তু প্রকৃত নস্‌খ হলে বিধানের পুনরাবর্তন সম্ভব হতো না। যেমন পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তের নাস্‌খ প্রকৃত নাস্‌খ। সুতরাং সে সব শরীয়ত আর পুনপ্রতিষ্ঠিত হবে না।

অভিজ্ঞ ও পারদর্শী চিকিৎসক যেমন রোগের সাময়িক নতুন উপসর্গ ঠেকাবার জন্য ঔষধ বদলে দেন, আবার যখন রোগের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরে আসে তখন পূর্বের ব্যবস্থা বহাল করেন, শরীয়ত-ই মুহাম্মাদীয়ার নাস্‌খও তদ্রূপ।

নাস্‌খের উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি নীতির সন্ধান মিলে সেটি হচ্ছে, মুহাককিক অর্থাৎ গবেষক আলেমগণের সাথে পরামর্শক্রমে, সাময়িক সামাজিক কল্যাণ ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আইন-প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ শরীয়তের কোন কোন আহ্‌কামের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে পারেন, যেমন উলামায়ে সালাফ (سلف)-এর যুগে এই নীতির ভিত্তিতে কাজ হয়েছিল। কাযী বাইদাবীর[১৯] নিম্নলিখিত উক্তি একথারই ইঙ্গিত বহন করছে ঃ

وذلك لان الاحكام شُرعت والايات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلا من الله ورحمة و ذلك يختلف باختلاف الاعضاء والاشخاص كاسباب المعاش فان النافع فى عصروا حديضر فى غيره-

'(নাস্‌খ বৈধ এ জন্য যে) আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে, বান্দাদের কল্যাণ ও প্রয়োজনে এবং তাদের নফসের পরিপূর্ণতার জন্য আহ্‌কাম বিধিবদ্ধ হয়েছে, আয়াত নাযিল হয়েছে, আর এই কল্যাণ ও প্রয়োজন ব্যক্তি ও যুগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ বিভিন্ন হয়। এক যুগে যেসব উপায়-উপকরণ উপকারী হয় তা অন্য যুগে হতে পারে ক্ষতিকর।'

হযরত উমর রা.-এর 'একক সিদ্ধান্তবলী' এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। এগুলো আসলে এমন ধরনের 'একক সিদ্ধান্ত' নয়, কারো ব্যক্তিগত কিয়াস ও রায়ের ভিত্তিতে স্থগিত হবার কারণে যার গুরুত্ব কম হয়ে যায়। বরং এই নাস্‌খ শরীয়তের রূহ বা প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন রেখে, কুরআনী বিধানসমূহকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াবার প্রয়াসের সর্বোত্তম উদাহরণ ছিল। পরবর্তীদের জন্য হযরত উমর রা.-এর একক সিদ্ধান্তগুলো পথ নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে।

এই নাস্‌খ নীতি থেকেই ফকীহগণ ইসতিহসান, ইসতিসলাহ, তা'দীল تعديل (ভারসাম্য রক্ষা) ইত্যাদি মূলনীতি সমূহের উদ্ভাবন করেছেন এবং সেগুলোকে "আইনের উৎস" সমূহের অন্তর্ভুক্ত স্থির করেছেন।

www.pathagar.com

'রদ্দুল মুহতার' প্রমুখ ফিক্‌হ গ্রন্থগুলোতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে জন কল্যাণের ভিত্তিতে আইন প্রয়োগ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও ইখতিয়ার খুবই ব্যাপক বলে মেনে নেয়া হয়েছে। এমন কি ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-প্রয়োগ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করতে পারে কিংবা মুলতবী ঘোষণা করতে পারে এই নাস্‌খ নীতির প্রেক্ষিতে। ফকীহগণ আইনের ব্যাপকতা সীমিতকরণ (تعميم و تخصيص) ইত্যাদি নাস্‌খ নীতি প্রয়োগের যে সব পদ্ধতি স্থির করেছেন সেগুলোকে সাকূল্যে বর্জন করলে লাগামহীন বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছা-প্রবণতার বিধ্বংসী পরিণাম থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় থাকে না।

পঞ্চম মূলনীতি ঃ শানে নুযুল

অর্থাৎ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট। শানে নুযুল বিশেষ ঘটনা নয় বরং অবস্থা ও পরিস্থিতি।

কুরআনের সূরা ও আয়াতগুলো মক্কী ও মাদানী এই দুইভাগে বিভক্ত। শানে নুযুল থেকে বিশেষভাবে অবতীর্ণ আয়াত এবং সূরার বিষয়সমূহের প্রেক্ষাপটও পরিবেশ নির্ধারণ করা যায়, তবে শানে নুযুলের আওতায় যেসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়, আয়াতের লক্ষবস্তু সে সব ঘটনা নয়, বরং লক্ষবস্তু হচ্ছে জনগণের অবস্থা ও পরিস্থিতি যা বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে পরিস্ফুট হয় এবং যে পরিস্থিতির মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ সমাজ যেসব অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হয় এই ঘটনাবলী সেগুলোরই প্রতিনিধিত্ব করে, এবং সেগুলোকে চিহ্নিত ও উপলব্ধি করার ব্যাপারে ঘটনাগুলো তথ্য সরবরাহ করে।

বর্ণিত এই ঘটনাবলী নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে ঠিক ততখানি যতখানি কুরআন মজীদের স্পষ্ট বাক্যগুলোর সমর্থন থাকবে তাদের পেছনে। যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শব্দ ও অর্থ থেকে যা প্রকাশিত হয় এই ঘটনাবলী তার বিরোধিতা করছে অথবা কোনো মূলনীতির ওপর আঘাত হানছে, তাহলে বর্ণিত এই ঘটনাবলী কোনো গুরুত্ব লাভ করবে না। বরং সে ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতই হবে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। এ কারণে বিজ্ঞ মুফাসসিরগণের মতে প্রকৃত শানে নুযুল হচ্ছে যা আয়াতের পূর্বাপর সম্বন্ধ এবং শব্দ ও অর্থের মধ্য থেকে ভেসে ওঠে। 'আল্লামা সুয়ূতির নিম্নোক্ত বক্তব্য একথা সমর্থন করে।

"যারকাশী র. বুরহান-এ লিখেছেন, সাহাবী ও তাবেঈগণ সাধারণত বলতে অভ্যস্ত ছিলেন, উমুক আয়াত উমুক বিষয়ে নাযিল হয়েছে। এর অর্থ হয় উক্ত আয়াতটি ঐ বিধান সম্বলিত অর্থাৎ আয়াতটি বিধানের প্রমাণ। আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার বর্ণনা উদ্ধৃত উদ্দেশ্য হয় না এবং ঘটনাটি আয়াতটি নাযিলের কারণও হয় না।...... আমি বলি, ঘটনা যে সময় সংঘটিত হয়েছে আয়াতটিও ঠিক সেই সময় নাযিল হওয়া

www.pathagar.com

অপরিহার্য নয়। আয়াত নাযিল হওয়ার পেছনে যেসব কার্যকারণ সক্রিয় তার মধ্যে ঘটনাটির কোনো অপরিহার্যতা নেই।

কুরআনের আয়াত থেকে শানে নুযুল বের করার একটি দৃষ্টান্ত

কুরআনের আয়াত থেকে আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বের করার বিষয়টি একজন অভিজ্ঞ ও পারদর্শী চিকিৎসকের সাথে তুলনীয়। তিনি ব্যবস্থাপত্র দেখেই রোগের সন্ধান পেয়ে যান, যে রোগের জন্য এ ব্যবস্থাপত্রটি লেখা হয়েছে। ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত ঔষধগুলোর বৈশিষ্ট ও প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তিনি রোগীর মেজাজ ও অবস্থা অধ্যয়ন করে নেন। এই সঙ্গে রোগীর মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে নিজের মতামতের পক্ষে তিনি অতিরিক্ত সমর্থন লাভ করেন এবং এভাবে তাঁর মত সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এভাবে কুরআন হাকীম অধ্যয়ন করার ফলে সবচেয়ে বড় যে লাভটি হবে সেটি হচ্ছে, মূলনীতি ও পূর্ণাঙ্গ নীতিগুলো সুস্পষ্টভাবে সামনে ভেসে উঠবে। এটিই এখানে কাঙ্খিত উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ ও সমস্যার সমাধান নির্ণয় সহজ হবে। তাছাড়া পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে ঘটনাবলীকে সংযোজিত করার পথও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর শানে নুযুলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা ও সমর্থনমূলক সুবিধা লাভের সাথে সাথে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাও লাভ করা যাবে। সেটি হচ্ছে, এর মাধ্যমে কুরআনী বিধানের হিকমত (বিজ্ঞানময়তা) ও ইল্লাত (কার্যকারণ) জানার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এর ফলে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপকতা এবং বিধানকে অবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী বাস্তব রূপ দানের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ মূলনীতি ঃ হিক্মত (حكمة) ও ইল্লাত (علة)-এর বিবেচনা

কুরআনের বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে হিকমত ও ইল্লাতের আলোচনা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও গভীর। এ দুয়ের কারণে অতীতের সাথে বর্তমানের সম্পর্কচ্ছেদ হয় না। উম্মতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাবিদগণ এ প্রসঙ্গে বিরাট অবদান রেখেছেন। তাঁরা কুরআনী শিক্ষাকে মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রমাণ করে এই জীবন বিধানের চিরন্তনতা ও সর্বজনীনতা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।[২০] এ প্রসঙ্গে মৌলিক কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন হাকীমের ভাবধারাগত ও বাস্তব ব্যবস্থার ওপর গভীর দৃষ্টির অধিকারী হওয়া যাবে না ততক্ষণ ইল্লাত সন্ধানের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হতে পারে না। সঠিক দৃষ্টিকোণ সৃষ্টির জন্য গবেষককে অন্য সব বিষয়ের মধ্যে কুরআন মজীদে বর্ণিত নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলোর উপর সঠিকতর গুরুত্ব দিতে হবে ঃ (১) দীন ও দুনিয়ার সম্পর্ক, (২) জীবন ও মৃত্যুর আত্মিক যোগাযোগ, (৩) দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কার ও শাস্তির বিধান, (৪)

www.pathagar.com

মানসিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের নীতি, (৫) প্রকৃত সাফল্য ও কল্যাণের পথ, (৬) মানবিক প্রকৃতি, (৭) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের চৌহদ্দি, (৮) জীবনের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কিত বিধান, (৯) পথ প্রদর্শনের পর্যায়ক্রম এবং তার ক্রম বিবর্তন। (১০) জাতীয় স্বার্থ ও রাজনীতি এবং (১১) বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি ইত্যাদি।

কুরআন হাকীমে এমন বহু বিধান রয়েছে যার মধ্যে উল্লাত বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। ফকীহগণ সেগুলো থেকে দলীল-প্রমাণ গ্রহণ ও বিধান উদ্ভাবনের যেসব পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি। অন্যথায় নির্দিষ্ট সীমানা ও শর্তের প্রতি দৃষ্টি না থাকার দরুন ভুল দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের পরিণাম বিভ্রান্তিকর হয়ে যেতে পারে। অনুরূপভাবে আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে কুরআন হাকীম যে বর্ণনা শৈলী অবলম্বন করেছে তাও যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী। গন্তব্যে উপনীত হবার ব্যাপারে তা যথেষ্ট সাহায্য করে।

সপ্তম মূলনীতি ঃ আরবের সামাজিক অবস্থার জ্ঞান

কুরআন হাকীমের খুঁটিনাটি (جزئيات) বিধানের প্রেক্ষিতে আরবের সামাজিক অবস্থার খতিয়ান নিলে দেখা যাবে বিধানগুলোতে তদানীন্তন সমাজের অবস্থাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আসলে এই আলোচনা আল্লাহর হেদায়াতের ধরণ ও গুণগত অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তাই নীচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

আল্লাহর হেদায়াতের সামনে সব সময় দুটি উদ্দেশ্য দেখা গেছে ঃ

(১) মানসিক ও আত্মিক সংস্কার এবং

(২) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ ও সাফল্য

এই দৃষ্টিতে আল্লাহর হেদায়াতে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন দুই ধরনের আইন পাওয়া যায় ঃ

(১) যার প্রাণশক্তি ও কায়া অর্থাৎ অর্থ ও বাহ্যিক আকৃতি উভয়টিই শরীয়ত নির্ধারণ করেছে একং উভয়কে উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করেছে।

(২) যার কেবলমাত্র প্রাণশক্তিই উদ্দেশ্য, বাহ্যিক আকৃতি উদ্দেশ্য নয়।

প্রথম ধরনের আইন অপরিবর্তনীয় এবং একই অবস্থায় বিরাজিত থাকবে, তার মধ্যে আকার আকৃতি প্রাণশক্তির দিক দিয়ে কোনো প্রকার পরিবর্তন হতে পারে না। আর দ্বিতীয় ধরনের আইনগুলো যেহেতু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সময়ের সাথে সম্পর্কিত তাই অবস্থার পরিবর্তন ও তমদ্দুনিক উন্নতির সাথে সাথে তাদের আকার আকৃতি পরিবর্তিত হতে পারে। আইন প্রবর্তকের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র তাদের প্রাণশক্তির স্থায়িত্বের দাবি করা হয়। শাহ অলিউল্লাহর নিম্নোক্ত বক্তব্য এদিকে ইঙ্গিত করে ঃ

www.pathagar.com

ان الشرائع لها معدات واسباب تشخصها وترجع بعض محتملاتها على بعض-

সব শরীয়তেরই কতগুলো কার্যকারণ থাকে সেগুলো বিধানের আকৃতি নির্ধারণ করে এবং এক সম্ভাবনাকে অন্য সম্ভাবনার ওপর অগ্রাধিকার দেয়।'[২২] অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ

يعتبر فى الشرائع علوم مخزونة فى القوم واعتقادات كامنة فيهم وعادات تتجارى فيهم-

'শরীয়ত প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় জাতির সঞ্চিত জ্ঞান, তাদের অন্তর্নিহিত আকীদাসমূহ এবং তাদের আচার-আচরণ, যার শিকড় তাদের গভীরে প্রোথিত থাকে। উপরোক্ত প্রথম প্রকারের আইনগুলোর মর্যাদা রূহ ও ভিত্তির পর্যায়ভুক্ত। তারি মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রকারের আইনের পলিসি এবং সাংস্কৃতিক কল্যাণের সঠিক দৃষ্টিকোণ নির্ধারিত হয়।[২৩]

দ্বিতীয় প্রকার আইনে আরবের সামাজিক অবস্থার প্রভাব

এটি একটি সর্বসম্মত বিষয় যে, দুনিয়ার কোনো আইনই সমকালীন সমাজের রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। এ জন্য অনিবার্যভাবে আরবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রভাব হিদায়েতে ইলাহীর ওপর পড়েছে।

কোন আইন প্রণেতা বা আইন প্রণয়ন পরিষদ যখন কোনো দেশের জন্য আইন রচনায় মনোনিবেশ করেন, তখন স্বাভাবিক ভাবে সর্বপ্রথম তিনি বা তারা সংশ্লিষ্ট দেশের পূর্ব প্রচলিত বিধি বিধান ও রীতি-নীতির প্রতি নজর দেন, কিছু অংশকে হুবহু গ্রহণ করেন, কিছু অংশ সংস্কার করে গ্রহণ করেন এবং কিছু অংশ পুরোপুরি বর্জন করেন। আল্লাহর হেদায়াতের প্রচারের ক্ষেত্রেও একই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য।

আল্লাহর হেদায়াতে প্রচলিত বিধান ও রীতির বিবেচনা

কিন্তু প্রচলিত বিধান ও রীতি গ্রহণ ও পরিত্যাগ করার ব্যাপারে হামেশা দুটি বিষয় দৃষ্টিপথে থাকে ঃ

এক. গ্রহণ ও বর্জনের প্রতিটি পর্যায়ে সামাজিক পরিস্থিতি ও গণ-চেতনার অবস্থা সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়।

দুই. যেসব আইন ও রীতি নীতি গ্রহণ করে নেয়া হয় সেগুলোকে আল্লাহর হেদায়াতের প্রাণরসে সিক্ত করা, অর্থাৎ সেগুলোকে আল্লাহর হেদায়াতের ছাঁচে এমন ভাবে ঢালা হয় যার ফলে সেগুলো আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থায় যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যায়।

www.pathagar.com

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِيْ اِسْرَا ئِيْلَ اِلاَّ مَا حَرَّمَ اِسْرَا ئِيْلُ عَلى نَفْسِه-

'সমস্ত খাদ্য বস্তু বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল, তবে যে খাদ্যবস্তু ইসরাঈল (য়া'কূব আ.) নিজেই নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন তা ছাড়া।'

বোঝা যায় য়াকূব আ. বিশেষ অবস্থা দৃষ্টে কতিপয় খাদ্যবস্তু হারাম করে নিয়েছিলেন। নূহ আ.-এর জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। তাদের যৌন শক্তি সংযত করা ও মেযাজে ভারসাম্য সৃষ্টি করার উদ্দেশে রোযা ইত্যাদির বিধান কঠিন করে দেয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে, মূসা আ.-এর জাতি ছিল অত্যন্ত বিদ্রোহী স্বভাবের অধিকারী। তাদের মেযাজে ভারসাম্য সৃষ্টি করার জন্য কঠোর অনুশাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الذ ينَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّ هِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ كَثِيْرًا النساء-١٤٠

'ইহুদীদের জুলুমের কারণে আমি কয়েকটি পবিত্র জিনিস তাদের ওপর হারাম করে দিয়েছি, যা (ইতিপূর্বে) তাদের জন্য হালাল ছিল; এ জন্যও যে, তারা লোকদেরকে আল্লাহর পথে চলতে অনেক বেশি বাধা দিতো।'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিভিন্ন মেযাজ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব চাইতে বড় নেকী কোনটি এই প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন, যেমন কোনো ব্যক্তিকে বলেছেন, পিতামাতার সেবাই সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ। কাউকে বলেছেন জিহাদ, কাউকে ইহসান তথা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীরতর করাকে বৃহত্তম নেকী বলেছেন। এভাবে তিনি যে ব্যক্তির জন্য যে জিনিসটির প্রয়োজন বোধ করেছেন, সেই জিনিসটির ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন। অবস্থার পরিবর্তনে আইন ও বিধানের মধ্যে পরিবর্তনের দৃষ্টান্তও বহু হাদীসে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

নবীগণ জাতির চিকিৎসক

আসলে নবীরা হচ্ছেন জাতির চিকিৎসক। তাঁরা জাতির রোগ ও মেযাজ অনুযায়ী খাদ্য ও ঔষধ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

একজন অভিজ্ঞ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী চিকিৎসক যেমন রোগীকে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র দেবার সময় তার শরীরের উত্তাপ, শীতলতা, শক্তি এবং তার স্বভাব প্রকৃতি, বয়স ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য মনে করেন ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক চিকিৎসক স্বভাব ও মেযাজকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখার জন্য

www.pathagar.com

উপরে উল্লেখিত সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরি মনে করেন এবং ঐগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঔষধ, খাদ্য এবং নিষিদ্ধ খাদ্য ও বিষয়াদি সম্বলিত ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী বলেন ঃ

انما مثله كمثل الطبيب يعمل الى حفظ المزاج المعتدل فى جميع الاحوال فتختلف احكامه باختلاف الاشخاص والزمان فيأمر الشاب بمالا يأمر الشائب ويأمر فى الصيف بالنوم فى الجو لما يرى ان الجو مظنة الاعتدال حينئذ ويأمرفى الشتاء بالنوم داخل البيت لمايرى انه مظنة البرد حينئذ-

'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন একজন চিকিৎসক যিনি সর্ব অবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ মেযাজ সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত থাকেন। তার ব্যবস্থা বিভিন্ন ব্যক্তি ও সময়ের বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যুবকের জন্য তিনি যে ব্যবস্থাপত্র দেন বৃদ্ধের জন্য হুবহু একই ব্যবস্থাপত্র দেন না। গরমকালে উন্মুক্ত স্থানে ঘুমাবার পরামর্শ দেন। শীতকালে ঘরের মধ্যে শয়ন করার নির্দেশ দেন, অবস্থা ভেদে যা ভারসাম্য বজায় রাখার অনুকূলে।'[২৪]

রোগ নির্ণয়ও ব্যবস্থাপত্র প্রদানের সীমারেখা

রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপত্র প্রদানের ব্যাপারে আম্বিয়া আ.-এর ভূমিকা না এমন পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয় যাতে তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো যে কোনো নীতি নিয়ম নির্ধারণ করার অধিকারী হন, আবার তাঁরা এমন একেবারে অধীনও নন যাতে প্রত্যেকটি ছোট বড় ফায়সালার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। বরং অহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে আল্লাহর হেদায়াতের মূলনীতি জানিয়ে দেয়া হয়। কোন ব্যাপারে সুস্পষ্ট হেদায়াত এসে গেলে ভালো, অন্যথায় তাঁরা উপরোল্লিখিত মূলনীতির আলোকে নিজেদের ইজতিহাদের মাধ্যমে ফায়সালা প্রদান করেন। তাঁদের ফায়সালা হেদায়েত ইলাহীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। যদি কোনো বিশেষ কল্যাণ বা ব্যাপারের কারণে এই ফায়সালা সাময়িক পর্যায়ের হয় তাহলে যখন ওই কল্যাণকারিতা খতম হয়ে যায়, ফায়সালাও খতম হয়ে যায় অথবা তাকে মূলতবী করে দেয়া হয়। অন্যথায় অন্যান্য ইলাহী আইনের ন্যায় এই ফায়সালার কার্যকারিতাও বর্তমান থেকে যায়।

ইজতিহাদী ভুল সম্পর্কে অবহিতি

যদি কোনো সময় অবস্থা পর্যালোচনার ব্যাপারে নবীগণের স্খলন হয়ে যায়। যার ফলে কোনো অ-উত্তম ফায়সালা গৃহীত হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তাদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। কুরআনের

www.pathagar.com

বেশ কয়েকটি উদাহরণে দেখা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমষ্টিগত ব্যাপারে 'রহমত'-এর প্রেরণায় কোনো নির্দেশ দেন, অথচ 'আদল' অর্থাৎ ইনসাফের বিবেচনায় নির্দেশটি যথাযথ ছিল না। এমতাবস্থায় অহীর মাধ্যমে তাঁকে আল্লাহ্ সে ব্যাপারে অবহিত করেন। অথবা ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি এমন কোনো কাজ করেন যা তাঁর মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়। অতএব নিসন্দেহে আমরা একথা বলতে পারি যে, নবীগণ ভুল ও স্খলন থেকে সংরক্ষিত থাকেন এবং দীনের ব্যাপারে যেসব কথা তাঁরা বলেন, সেগুলোর মর্যাদা হয় ঠিক নিম্নোক্ত পর্যায়ের ঃ

وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَاِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحى-

অর্থাৎ 'তিনি নিজের মনগড়া কোনো কথা বলেন না, যা কিছু তিনি বলেন তা সবই তাঁর কাছে আল্লাহর প্রেরিত অহী।' আল্লামা ইবনে কাইয়িম র. বলেন ঃ

ان الرای انما کان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا بان الله کان يُريه وانما هومن الظن والتكليف-

'দীনের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রায় সঠিক হবার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাঁকে পথ দেখিয়ে থাকেন। অন্যদিকে আমাদের রায় আমাদের ধ্যান ধারনার ফসল এবং হুকুম পালনের ব্যাপার।'[২৫]

প্রচলিত বিধান রীতিনীতি ও পছন্দনীয় বিষয়ে গ্রহণ বর্জনের নীতি

নবীগণ প্রচলিত বিধান, রীতিনীতি, প্রিয় ও পছন্দনীয় বিভিন্ন বিষয়কে সমূলে বিনাশ করার জন্য তরবারি উন্মুক্ত করে থাকেন না। কোথাও কোনো কিছু প্রচলিত দেখলেই তাঁরা তখনি তাকে খতম করে দেননি। কোনো জিনিস মানুষের অত্যন্ত প্রিয় দেখলেই সঙ্গে সঙ্গেই তা থেকে তাঁরা মানুষকে বিরত রাখেন নি। বরং লোকদের মানসিকতার প্রেক্ষিতে তাঁরা خُذْمَاصَفَا وَدَعْ مَاكَدَرَ (যা কিছু পরিচ্ছন্ন তা গ্রহণ করো এবং যা কিছু অপরিচ্ছন্ন ও ঘোলাটে তা বর্জন করো এর নীতি অবলম্বন করেন। যেমন শাহ অলি উল্লাহ র. বলেন ঃ

فما كان صحيحا مُوَا فقًا لقواعد السياسة الملية لايغير بل تدعوا اِلَيْهِ وتحث عليه وما كان سقيما قد دخلته التحريف فانها تغيره لقدرا لحاجة وماكان خريا ان يراد فانها تريد على ماكان عندهم-

'এইসব বিধান ও রীতিনীতির মধ্যে যে কথাগুলো নির্ভুল ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তাঁরা সেগুলোতে কোনো পরিবর্তন সাধন করেন না। বরং তাঁরা সেগুলোর দিকে আহ্বান জানাতে থাকেন এবং জাতিকে

www.pathagar.com

উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করতে থাকেন। আর খারাপ বিষয়গুলো অথবা যেসব বিধানকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করা হয়ে থাকে সেগুলোকে তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার করেন আবার যেগুলো বাড়াবার প্রয়োজন বোধ করেন সেগুলো বাড়িয়েও দেন।'[২৬]

মোট কথা পূর্বের বহু বিধান, রসম-রেওয়াজ এবং জনগণের পছন্দনীয় ও প্রিয় বিষয়, আইনের মর্যাদা লাভ করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়।

শেষ হেদায়াতের সময় আরবের প্রচলিত আইনের স্বরূপ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবকালে আরবে নিম্নোক্ত ধরনের আইন ও বিধান জারী ছিল ঃ

(১) বাদীর কাছ থেকে তার দাবি প্রমাণের জন্য সাক্ষী চাওয়া হতো। সাক্ষী না থাকলে এবং বিবাদী বাদীর দাবি অস্বীকার করলে বিবাদীকে কসম করতে হতো।

(২) অপরাধের দণ্ড দীয়াত বিধানের নীতি ছিল প্রতিশোধমূলক। আর এটা دية দীয়াত শোনিত পণ্য বা معاوضة মো'আবিদা বা ক্ষতিপূরণের আকারেও হতে পারতো। চোরের ডান হাত কাটার রেওয়াজ ছিল। যিনাকারীর শাস্তি নির্ধারিত ছিল পাথরের আঘাতে হত্যা। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশ ঘা চাবুক মারা ও মুখে চুনকালি মাখিয়ে ফেরানো হতো।

(৩) বিয়েতে ইজাব এবং কবুলের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং অন্যান্য পদ্ধতিরও প্রচলন ছিল যথা সাময়িক বিবাহ বা متعه (মুত্'আ) যে কারণে ব্যভিচারের প্রসার ঘটতো এবং পারিবারিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। অনুরূপভাবে স্ত্রীদের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না, নিজেদের ইচ্ছায় বিয়ে করার অধিকার মেয়েদের ছিল না। কোনো কোনো মাহ্রাম (যার সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ)-এর সঙ্গে বিয়ের রীতি ছিল। মহর (مهر)-এর ব্যাপারে নারীর অধিকার অত্যন্ত সীমিত ছিল। তালাকের ব্যাপারে পুরুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ঈলা[২৭], যিহার[২৮] ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

(৪) বাঈ (بيع=বেচাকেনা), হিবা (حبة=দান) রিহান (رحن=বন্ধক) ইজারা (اجارة=ভাড়া) ইত্যাদির মাধ্যমে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করার রীতি ছিল। এমন সব শর্তে বেচাকেনা হতো যাতে বিবাদ সৃষ্টি হতো। জুয়া খেলার প্রচলন ছিল ব্যাপক। দ্রব্য বিনিময়ের বহু রীতির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের 'বাঈ' পাওয়া যেতো। এর মধ্যে কোনো কোনোটার ভিত্তি মূর্খতা, অজ্ঞতা ও পারস্পরিক বিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবার কোনো কোনোটা ছিল জুয়া ও সাট্রার আকারে।

কয়েকটির উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল ঃ

www.pathagar.com

বাঈ সালাম (بيع سلم=অগ্রিম মূল্য প্রদান-নির্ধারিত ভবিষ্যতে সামগ্রী হস্তান্তরের অঙ্গীকার),

বাঈ সারাফ (بيع صرف=মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি।

পণ্য দ্রব্যের উপর পাথর নিক্ষেপে পণ্য স্পর্শে বিক্রি (ملا مسة)।

বিক্রেতা পণ্যদ্রব্য নিক্ষেপ করলে বিক্রি (منا بذة)।

ক্ষেতের অপক্ক শস্য বা গাছে ঝোলা ফলের শস্য বা ফলের বিনিময়ে (مزابنة) ইত্যাদি। পূর্বেই বলা হয়েছে কোন কোন ধরনের লেনদেন দু'পক্ষের মধ্যে প্রায়শই বচসা এবং ঝগড়ার সৃষ্টি করত।[২৯]

(৫) নগদ ভাড়ায় জমি ইজারা (اجارة) বা শস্য ভাগের শর্তে বর্গা দেবার রেওয়াজ ছিল।

(৬) ঋণ (قرض) ও সূদের (ربوا) প্রচলন ছিল।

(৭) অসিয়্যাত (وصية)-এর মাধ্যমেও সম্পত্তি হস্তান্তর করা হতো।

(৮) মামলার বিচার বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। গোত্রের সরদার জনমতের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশ দিতো ও কার্যকর করার ব্যবস্থা করতো। বাইরের ব্যাপারে সরদার গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতো। প্রয়োজনে সরদারের সাহায্যের জন্য বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লোকদের একটি মজলিস-ই শূরা (شورى=পরামর্শ সভা) গঠন করা হতো। মোট কথা অভ্যন্তরীণ ও বাইরের যাবতীয় বিষয় সরদারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতো।

স্থানীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে আল্লাহ প্রেরিত নবী রসূলদের কর্মপন্থা কি ছিল তা শাহ অলি উল্লাহর নিম্নোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে যায় ঃ

والذى اتى به الانبياء قاطبة من عند الله تعالى فى هذا الباب هو ان ينظر الى ماعند القوم من اداب الاكل والشرب واللباس والبناء ووجوه الزينة ومن سنة النكاح وسيرة المتناكحين ومن طريق البيع والشراء ومن وجوه المزاج عن المعاصي وفصل القضايا ونحوذلك فان كان الواجب بحسب الرأى الكلى منطبقا عليه فلا معنى لتحويل شئى من موضعه ولا العدول عنه الى غيره بل يجب ان يحث القوم على الاخذ بما عند هم وان يصوب رايهم فى ذلك ويرشدوا الى مافيه من الصالح وان لم ينطبق عليه ومست الحاجة الى تحويل شئى اواخماله لكونه مفضيا الى تاذى بعضهم من بعض اوتعمقا لذات الدنيا واعراض عن الاحسان اومن المسليات؟ التى تودى الى اهمال مصالح الدنيا والآخرة ونحوذلك فلا ينبغى ان

www.pathagar.com

يخرج الى مايبا ين مالو فيهم بالكلية بل يحول الى نظير ماعندهم اونظير ماشتهر من الصالحين المشهود لهم بالخير عند القوم–

'নবীগণ মহান আল্লাহর কাছ থেকে এ সম্পর্কে যা নিয়ে আসেন তন্মধ্যে আগে দেখতে হবে সমাজে কী প্রচলিত আছে– যেমন ঃ পোশাক, বাসগৃহ, সাজ-সজ্জা, নিকাহের পদ্ধতি, বিবাহ প্রয়াসী পক্ষদ্বয়ের চরিত্র যাচাই, বেচাকেনার পদ্ধতি, পাপের শাস্তি বিধান, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি যদি সামগ্রিক ভাবে শরীয়তের পলিসির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে নিরর্থক হবে কোন পরিবর্তন বা অন্য কোন আইনের প্রবর্তন বরং ওয়াজিব হবে তাদের মধ্যে প্রচলিত বিধি-বিধানের উপর স্থিত থাকতে তাদেরকে উৎসাহিত করা। তাদের রয়ের যথার্থতা ঘোষণা করা এবং যাতে কল্যাণ রয়েছে তার দিকে তাদেরকে হেদায়েত করা। কিন্তু যদি দেখা যায়, তাদের মধ্যে প্রচলিত বিধি-বিধান শরীয়তের নীতি-পদ্ধতির সাথে বনে না– সে বিধানগুলো তাদেরকে পারস্পরিক ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, অথবা তাদেরকে পার্থিব ভোগে নিমগ্ন করে অথবা সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম (احسان) থেকে বিরত করে অথবা পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রচেষ্টাকে নস্যাত করে যার ফলে এই বিধান ও রীতিগুলোতে পরিবর্তন করা অথবা এগুলোকে পুরোপুরি খতম করে দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে নবীগণের পক্ষে সমীচীন হয় না তাদের বিধি-বিধান বহাল রাখা, এবং তারা মনোনিবেশ করবেন তাদের কাছে যে সব নযীর রয়েছে তার দিকে অথবা যারা সৎকর্মশীল বলে কওমের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত তাদের কর্মবিধানের নযীরের দিকে।'

অন্যত্র শাহ সাহেব র. শেষ হেদায়াতের প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

ان كنت تريد النظر فى معانى شريعة رسول الله صلى الله عليه و سلم فتحقق اولا حال الاميين الذين بُعث فيهم التى هى مادة تشري عه وثا نيا كيفية اصلاحه لها بالمقاصد المذكورة فى باب التشريع والتيسبر واحكام الملة–

'যদি তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়তের গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করতে চাও তাহলে প্রথমত যে নিরক্ষর আরবদের কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের অবস্থার অনুসন্ধান চালাও, তাদের অবস্থাদি তাঁর শরীয়তের উপকরণ স্বরূপ, দ্বিতীয়ত তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারের প্রকৃতি অনুধাবন করো, তবে তুমি দেখবে, শরীয়তের প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিধানকে সহজসাধ্য করতে গিয়ে এবং তাতে করে মিল্লাতকে মজবুত করবার প্রয়াসে তিনি কি সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ সামনে রেখেছিলেন।'

www.pathagar.com

ইসলামী বিধানের সর্বকালীনতা ও সর্বজনীনতা

আল্লাহর শেষ হেদায়াত ইসলাম যেহেতু শুধুমাত্র আরবদের জন্য ছিল না বরং দুনিয়ার সমস্ত মানব জাতির জন্য ছিল, তাই এই শরীয়তের মূলনীতি নির্ধারণের বেলায় আরব দেশ আরব জাতিসহ পৃথিবীর সব জাতের মানুষের মনন ও স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতি নজর রাখাও ছিল অপরিহার্য। কারণ মনের গোষ্ঠীকে আল্লাহ অভিন্ন মৌলিক উপাদানে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ তাদেরকে এক উম্মত বলে ঘোষণা করেছেন। এজন্য এ বিধানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামনে রাখা হয়েছে ঃ

এক. এমন কোনো নির্দেশ না দেয়া, যাতে অসহনীয় কষ্ট ও পরিশ্রম থাকে।

দুই. মানুষের মৌলিক প্রয়োজন, প্রকৃতিগত বাসনা ও প্রবণতার প্রেক্ষিতে এমন কিছু কিছু উপলক্ষ রাখা যাকে জাতীয় ঈদ উৎসব হিসেবে উদযাপন করা যেতে পারে এবং এর মধ্যে জায়েয ও মুবাহর সীমা অতিক্রম না করে আনন্দ ও সাজ-সজ্জার অনুমতি দেয়া।

তিন. আনুগত্য মূলক ক্রিয়াদি (طاعات) বিধিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও প্রবণতার প্রতি নজর রেখে কতিপয় সহায়ক এবং উদ্দীপকের অনুমতি দেয়া, যাতে দোষাবহ কিছু না থাকে।

চার. স্বাভাবিকভাবে যেসব জিনিস মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও অপছন্দের ভাব সৃষ্টি করে অথবা মানবিক প্রকৃতি ও মেযাজ যেগুলোকে গুরুভার মনে করে সেগুলোকে অবৈধ করা।

পাঁচ. (استقامة)-এর ব্যবস্থা অর্থাৎ মানুষকে হক (সত্য) এবং সত্য বিশ্বাস ও সৎ কর্মে অটল এবং মনের প্রকৃতিকে ইসলামী ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজে সহায়তার জন্য অসৎ কাজ নিষেধ করাকে সর্বকালীন এবং সর্বজনীন দায়িত্বরূপে স্থির করা।

ছয়. কোনো কোনো বিধান পালনের দুটো মান নির্ধারণ করা ঃ আযীমাত (عزيمة) অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মান এবং রুখসাত (رخصة) অর্থাৎ নিকৃষ্ট মান, যাতে করে কোন বিধান পালনের বেলায় মানুষ দুটো মানের যে কোনোটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে।

সাত. কোনো কোনো ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুটি বিভিন্ন ধরনের 'আমল বা কর্মের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে অবস্থার প্রেক্ষিতে যে- কোনটির অনুসরণের অবকাশ রাখা।

আট. কোনো কোনো নিষিদ্ধ কর্মের ক্ষেত্রে বস্তুগত লাভের বিবেচনা পরিত্যাগ করার হুকুম দেয়া।

নয়. বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকতা ও ক্রমোন্নতির নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখার নির্দেশ, যাতে ইসলামী দাওয়াতের সুচনাতেই একই সঙ্গে সবগুলো বিধান

www.pathagar.com

প্রবর্তন এবং একই সঙ্গে সবগুলো নিষিদ্ধ কর্মের নিষেধাজ্ঞা জারী করার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানান না হয়।

দশ. গঠনমূলক সংশোধনের ক্ষেত্রে জাতীয় চরিত্রের সবল ও দুর্বল উভয় দিকের প্রতি নজর রাখা।

এগার. বহু সৎ কাজের বিস্তারিত এবং পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাকে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর ন্যস্ত করা হয়নি। কারণ এভাবে ছেড়ে দিলে বহু কঠিন সমস্যা দেখা দিতো।

বার, কোনো কোনো বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অবস্থা ও মাসলিহারে (কল্যাণ বহতা=مصلحة)-এর প্রতি নজর রাখা হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও মেযাজের (temperament) প্রতি নজর রাখা হয়েছে। শরীয়তের বিধানগুলো গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে তাতে এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যেগুলো সামগ্রিক বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তার সাথে কোন বিশেষ স্থান বা জাতের প্রায়োগিক সম্পর্কের কোনো প্রশ্নই ছিল না।

মোটকথা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পর্যালোচনা করার পর কুরআনী তত্ত্ব ও মৌল নীতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা যত গভীর ও সুক্ষ্ম হবে ততই যে ইসলামী বিধানগুলো সর্ব-কালীন এবং সর্বজনীন এ কথাটি বোঝা যাবে। আর এই সাথে এও বোঝা যাবে যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাইরের কোনো পথ নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দেবে না।

গ্রন্থপঞ্জি

১. দেখুন তাফসীর কাশ্শাফ ২৯২ পৃষ্ঠা, তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১২৮ পৃষ্ঠা এবং তাফসীরে কবীরের পাদটীকা ৩৮০ পৃষ্ঠা।
২. বুখারী ও মুসলিম-মিশকাত থেকে ৩২৩ পৃষ্ঠা।
৩. বুখারী, শিহাবুদ্দীন ইয়াসার।
৪. দারু কুতনী।
৫. তিরমিযী ও আবূ দাউদ।
৬. মুসলিম ১ম খণ্ড ৪২৯ পৃষ্ঠা, কা'বার পুনঃনির্মাণের সময় কুরায়শগণ নির্মাণ সামগ্রীর অভাবে মূল ভিতের খানিকটা অংশ বাইরে রেখেছিল। পদচিহ্ন চিহ্নিত যে অংশটিকে বলা হয় حطيم।
৭. তিরমিযী ও বুখারী, ২য় খণ্ড ১০৮২ পৃষ্ঠা।
৮. তাফসীর কাশ্শাফ ২৯২ পৃষ্ঠা, তাফসীর কবীর ৫ষ্ঠ খণ্ড ১২৮ পৃষ্ঠা, তাফসীর কবীর ফুটনোট ৩০০ পৃষ্ঠা।
৯. দারু কুতনী, মিশকাত থেকে ঃ ই'তিসাম।
১০. মুসলিম
১১. বুখারী ও মিশকাত, বাবু-কাসদিল আমল।
১২. কুরতুবী ৩য় খণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১৩. বুখারী ২য় খণ্ড ৭৪৭ পৃষ্ঠা।
১৪. আহকামুল কুরআন।
১৫. তাওযীহ তালবীহ ৩৩ পৃ. ইত্যাদি।
১৬. ই'লামুল মুআক্কিয়ীন।
১৭. ই'লামুল মুআক্কিয়ীন, ১ম খণ্ড ৩৯ পৃষ্ঠা।
১৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড ১২২ পৃষ্ঠা।
১৯. বাইদাবী ৯৮ পৃ.।
২০. মুকাদ্দিমার তাফসীর নিযামু'ল কুরআন ২৪ পৃষ্ঠা
২১. এ ব্যাপারে হযরত শাহ অলিউল্লাহ র.-এর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা অত্যধিক গুরুত্বের অধিকারী।
২২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ২৭-৯২ পৃষ্ঠা।
২৩. ঐ
২৪. হুজ্জাতুলাহিল বালিগা।
২৫. ই'লামুল মু'আক্কিয়ীন, ১ম খণ্ড, ৩২ পৃ.
২৬. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ৯ পৃ.
২৭. ঈলা ঃ কসম করে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্কচ্ছেদ করা।
২৮. যিহার ঃ স্ত্রীকে মায়ের পিঠের কোন প্রত্যংগের তুল্য বলে তার সংসর্গ ত্যাগ করা।
২৯. বাঈ সরফ ঃ মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি।

বাঈ সলম ঃ যে ব্যবসায়ের পণ্য দ্রব্যের মূল্য অগ্রিম দিতে হবে কিন্তু পণ্য দ্রব্য পরে নির্ধারিত সময়ে ক্রেতার মালিকানায় সোপর্দ করা হবে।

বাঈ খিয়ার ঃ যে ব্যবসায়ে বিকিকিনি নাকচ করে দেবার ইখতিয়ার থাকে।

বাঈ কাতঈ ঃ যাতে বিকিকিনি নাকচ করে দেবার ইখতিয়ার থাকে না।

মুরাবাহা ঃ নির্ধারিত লাভের ভিত্তিতে যে বেচাকেনা অনুষ্ঠিত হয়।

তওলীয়া ঃ আসল বাজার দরে যে বিকিকিনি অনুষ্ঠিত হয়।

ওদী' ঃ বাজার দরের কমমূল্যে বিকিকিনি অনুষ্ঠিত হওয়া।

মাসাওয়ামা ঃ লাভের ভিত্তিতে যে ব্যবসায় অনুষ্ঠিত হয়।

বাঈ বি-ইলকায়ে হাজার ঃ বিক্রি অসৎ পণ্যের ওপর পাথর খণ্ড নিক্ষেপে যে ব্যবসায় অনুষ্ঠিত হয়।

মালামাসা ঃ ছুঁয়ে দিলে যে বিকিকিনি অনুষ্ঠিত হয়ে যায়।

মানাবাযা ঃ দোকানদার কোনো জিনিস খদ্দেরের গায়ে নিক্ষেপ করে এবং তাতে বিকিকিনি অনুষ্ঠিত হয়।

মাযাবানা ঃ গাছে ঝুলন্ত খেজুরের ব্যবসায় গাছ থেকে পাড়া খেজুরের বিনিময়ে।

মাহাকালা ঃ শীষের সাথে থাকা অবস্থায় গমের অথবা পশুর পেটে থাকা অবস্থায় বাচ্চার বেচাকেনা।

অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৮, পৃষ্ঠা ঃ ৩১-৬২

রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে ভূমি ব্যবস্থা

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান

ভূমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দান। ভূমিতে উৎপন্ন ফল মূল ও ফসলজাত খাদ্য দ্রব্য খেয়েই আদিকাল থেকে মানুষ জীবন ধারণ করে আসছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমুদয় উদ্ভাবন এবং যাবতীয় শিল্প পণ্যের কাঁচামাল ভূমি হতেই উৎপন্ন হয়। তাই মানুষের জীবনে ভূমির নানাবিধ ও অপরিসীম গুরুত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারে না। ভূমির গুরুত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

'তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার দিগদিগন্ত বিচরন করো এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার গ্রহণ কর।'[১]

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরো বলেছেন ঃ

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না।'[২]

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষকে এই দুনিয়ায় প্রেরণ করে সুষ্ঠুভাবে পার্থিব জীবন যাপন করার জন্য অপরিহার্য জীবিকার ব্যবস্থা এই পৃথিবীতেই করে দিয়েছেন। তাই মানুষকে প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রধানত এ পৃথিবীর ভূমি থেকেই লাভ করতে হয়। এই ভূমি থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করার জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান চালাতে হয় এবং যে যে উপায়ে তা হতে জীবিকা সংগ্রহ করা সম্ভব, সে সে উপায়ে তা হতে ফসল ও দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ঈমানদার লোকগণ সাধারণভাবে যা কিছু উপার্জন করেন, তাকে অবশ্যই পবিত্র, নির্মল এবং সকল নিষিদ্ধ উপায় মুক্ত হতে হবে। সর্বোপরি ঈমানদার ব্যক্তিকে উৎপন্ন দ্রব্যে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এবং তাঁর সৃষ্ট মানুষের যে অধিকার রয়েছে তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।

পৃথিবীর প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম আ. থেকে ইসলামের সূচনা হয়ে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। রসূলুল্লাহ স. বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে এমন একটি মহান আসমানী

লেখক : প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, বাড্ডা আলাতুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা।

www.pathagar.com

কিতাব রেখে যান যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সঠিক ও নির্ভুল পথ দেখাবে। তিনি আল্লাহর এই কিতাবকে ধারণ করে পৃথিবীর বুকে একটি আদর্শ সমাজ, ভূমি নীতি ও কল্যাণ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে আমাদের জন্য অনুপম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। রসূলুল্লাহ স. যে ভূমি নীতি বাস্তবায়ন করে গেছেন তা আমাদের সামনে মডেল হিসাবে রাখা একান্ত জরুরী।

ভূমির পরিচয়

ভূমির একাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো ঃ

* ভূমি শব্দের অর্থ হল পৃথিবী, ভূ-পৃষ্ঠ, মাটি, মেঝে, ক্ষেত্র, জমি ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে মাটি বা জমির উপরিভাগকে ভূমি বলে।[৩]
* ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত প্রাথমিক স্তরের ক্ষয় সাধনের ফলে-যে ক্ষুদ্র কণা ভূ-পৃষ্ঠে জমা হয় এবং তার সাথে জৈব পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে যে পদার্থ গঠিত হয় তাই ভূমি বা মাটি।[৪]
* পানি প্রবাহ, হিমবাহ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, রোদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের শিলারাশির চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ক্ষয়িত অংশগুলো মৃত গলিত জীবদেহের সাথে মিশ্রিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে যে নরম ও কোমল স্তর বা আবরণ সৃষ্টি করে তাকেই মৃত্তিকা বলে। প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা হল-শিলাকণা, খনিজ দ্রব্য, জৈব পদার্থ, পানি, বায়ু, জীবানু প্রভৃতির একটি যৌগ মিশ্রণ। ভূ-ত্বকের উপরিস্তরের মাত্র ৫-৭ মিটার গভীর অংশ পর্যন্ত মৃত্তিকার অবস্থান।[৫]
* সময়ের ব্যবধানে নিকাশ-স্থিত অবস্থায় জলবায়ু ও জৈব পদার্থের সমন্বিত প্রভাবে রূপান্তরিত উৎস শিলা সৃষ্ট গাছ জন্মানোর উপযোগী ভূ-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক বস্তুর সমষ্টিস্তরকে ভূমি বলে।[৬]
* Soil is a dynamic body composed of mineral and organic materials and living forms in which plants grow.[৭]
* কোন বস্তু বা দ্রব্যকে আকার পরিবর্তন করে কিংবা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না করে যদি ভাড়ায় খাটানো যায়, তাকে ভূমি বলা হয়। ভূমি উৎপাদিত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এ অর্থে যন্ত্রপাতিও ভূমির অন্তর্গত।[৮]

মৃত্তিকা বা মাটি শব্দের আরবী প্রতিশব্দ 'তুরাব', আর ভূ-পৃষ্ঠ শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'আল-আরদ্ব'। কুরআনুল কারীমে 'সৃষ্টি' এবং 'পুনরুত্থান সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহে 'তুরাব' শব্দটি এসেছে। আর অন্যান্য আয়াতে এসেছে 'আল-আরদ্ব' শব্দটি। 'আল-আরদ্ব' শব্দটি কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'আরদ্ব' বা ভূ-পৃষ্ঠ বলতে আমরা যে গ্রহে বাস করছি তাকে বোঝান হয়।[৯] কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

'হে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না বিশেষ ক্ষমতা ব্যতিরেকে।'[১০]

ভূ-পৃষ্ঠ দ্বারা বাসস্থান বোঝানো হয়েছে যেমন কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে ঃ

'তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন।'[১১] কোন কোন আয়াতে 'আরদুন' শব্দটি বিস্তৃত বিছানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে ঃ

'যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাবে না।'[১২]

'আরদুন' শব্দটি মাটি অর্থেও কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–'যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনো ধৈর্যধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর–যেন তিনি ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্জী, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন। মূসা বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও?'[১৩]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।'[১৪]

মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি, এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমের ভাষ্য ঃ

'আমি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং এ থেকেই তোমাদেরকে বের করব।'[১৫]

মাটি মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে গণ্য। শুধু মানুষ সৃষ্টিই নয়; মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, জীব-জন্তুর আহার-বিহারের জন্য মহান আল্লাহ্ মাটিকে যোগ্যতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। মাটিতে লক্ষ কোটি ব্যাক্টেরিয়ার অস্তিত্ব (যা শস্য উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা রাখে) মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীবের প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার রয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে আহার্য, পানীয়-এর সংস্থান করে নেয়ার। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

'তিনি ভূমিকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য; এতে রয়েছে ফল-মূল এবং খর্জুর বৃক্ষ যার ফল আবরণযুক্ত এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ ফুল।'[১৬]

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

www.pathagar.com

'তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং তা হতে উৎপন্ন করি শস্য যা তারা আহার করে। তাতে আমি সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং তাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ। যাতে তারা আহার করতে পারে তার ফলমূল হতে, অথচ তাদের হাত তা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে।'[১৭]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক মৃত্তিকা বিজ্ঞান মাটি বা ভূমির যে সংজ্ঞা প্রদান করেছে তার বহু পূর্বেই কুরআনুল কারীম মাটির বিবরণী তুলে ধরেছে। সুতরাং আল-কুরআনের ভাষ্য মতে মাটি হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের সেই স্তর যেখানে মানুষ, জীবজন্তু তাদের প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভার সহজে পেতে পারে এবং উদ্ভিদরাজি খুব সহজেই জন্ম নিতে পারে বাধাহীনভাবে।[১৮]

মহান আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কাদার ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। আবার এই ভূমিকে এত শক্তও করা হয়নি যাতে উদ্ভিদরাজির অঙ্কুরোদগমে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কূপ ও খাল খনন করা যেত না; সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। মহান আল্লাহর সব সৃষ্টিই সুপরিকল্পিত ও সুষম। তিনি বলেন ঃ

'আর পৃথিবী, তাকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং আমি তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্‌গত করেছি সুপরিমিতভাবে। এবং তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও, তাদের জন্যও।'[১৯]

প্রয়োজনের তুলনায় গম, ধান, উৎকৃষ্টতর ফলমূল যদি এত বেশী উৎপন্ন হয় যা মানুষ ও জন্তুদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী পঁচে গিয়ে প্রাণীকুলের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এ জন্যই সর্বদা মহান আল্লাহ সবকিছুকে সুপরিমিত উৎপন্ন করেছেন। তাই মহান আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠকে মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং তা থেকে মহান আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

'তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁরই দিকে।'[২০]

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ 'যার ভূমি আছে সে যেন তা চাষ করে। আর যদি সে চাষ করতে অপারগ হয় তাহলে যেন তার ভাইকে দান করে দেয়।'[২১]

www.pathagar.com

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন পতিত অনাবাদি ভূমি আবাদ করবে সে নিজেই সে ভূমির মালিক হবে।'[২২]

এভাবে কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীস মানবমন্ডলীকে ভূমির সদ্ব্যবহার করে রিযিকের ব্যবস্থা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যার স্ফীতি কোন কোন দেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে বর্তমান পৃথিবীর বহু দেশে বিপুল পরিমাণ চাষযোগ্য জমি অনাবাদী পড়ে আছে। যেগুলো সদ্ব্যবহার করতে পারলে দারিদ্রের কষাঘাত ও খাদ্যাভাব থেকে মানব জাতি মুক্তি লাভ করতে পারে।

ভূমির গুরুত্ব

পৃথিবীতে মানুষ মহান আল্লাহর প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল সম্পদরাশি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। মানুষ তার বুদ্ধি-বিবেক, মেধা-দক্ষতা, কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা ভূমি ও সম্পদ কাজে লাগাবে। অন্যান্য নিয়ামতের মত ভূমি হল মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত। উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা অতীব প্রয়োজনীয় এক নিয়ামক। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভূমি প্রয়োজনীয় একটি মৌল সম্পদ। এটা মহান আল্লাহর অপার দান ও বিশেষ অনুগ্রহ।

ভূমির প্রতি গুরুত্বারোপ করে কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

'তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।'[২৩]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা আল্লাহর পথে ব্যয় কর; এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করার সংকল্প করো না।'[২৪]

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে পৃথিবীর বুকে বসবাসের সুযোগ করে দিয়ে তাদের পার্থিব জীবন সুন্দর সুষ্ঠুরূপে যাপন করার জন্য অপরিহার্য জীবিকার ব্যবস্থা পৃথিবীর বুকেই করে দিয়েছেন। মূলত ঈমানদার লোকগণ ভূমি হতে যা কিছু উপার্জন করবে, তাকে অবশ্যই পবিত্র, নির্মল এবং সকল নিষিদ্ধ উপায় মুক্ত হতে হবে। কেননা ভূমি হতে উৎপন্ন জীবিকায় এক দিকে সৃষ্টিকর্তার এবং অন্যদিকে সৃষ্ট মানুষের অধিকার রয়েছে। ঈমানদারগণ সজাগ দৃষ্টি রেখে মালিকানা অর্জন পূর্বক তাতে কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং ভোগ ও ব্যবহার করারও পূর্ণ অধিকার পাবে।[২৫]

পৃথিবীতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হযরত আদম আ.। আদম সন্তানের প্রথম ও প্রধান মৌলিক প্রয়োজন খাদ্য; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক এই খাদ্যের

www.pathagar.com

উৎস মূলত মাটি, পানি ও সূর্যকিরণ। সুতরাং মানব জাতির পিতা এবং বিশ্ব ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রথম প্রধান হযরত আদম আ.-এর বংশধরদের বেঁচে থাকা এবং ভূমির গুরুত্ব প্রায় সমার্থক। কাজেই উপযুক্ত ভূমি নীতির উপরই প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যের উৎপাদন তথা মানব জাতির জীবিকা সংরক্ষণ এবং বেঁচে থাকা সর্বতোভাবে নির্ভর করে।[২৬]

মূলধন ও প্রযুক্তি, শ্রম ও নৈপুণ্য, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মত ভূমিও উৎপাদনের একটি উপকরণ। তবে উৎপাদনের মৌলিক উপাদান ভূমি হওয়ায় এর গুরুত্ব অনেক বেশী। সাধারণত একটি যন্ত্র বা বাসগৃহ কিছু সময়ের জন্য অব্যবহৃত থাকলে তার মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু অতীব প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে জমির প্রয়োজন-সেই জমি যদি অব্যবহৃত থাকে বা জমিকে যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো না হয়, তবে কেবলমাত্র জমির মালিকই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং পুরো মানব সমাজই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।[২৭]

ইসলামের প্রথম যুগে আরবে ভূমি এবং ভূমিতে পশুচারণই ছিল সম্পদের প্রধান উৎস। তা দ্বারাই সম্পদের পরিমাপ করা হতো। এমনকি আজও উন্নয়নশীল দেশসমূহে, যেখানে জীবনধারণের মৌলিক দ্রব্য-সামগ্রীই কেবল উৎপাদন করা হয়, সেখানকার অর্থনীতিতে ভূমির গুরুত্বই সর্বাধিক। কারণ ভূমির উৎপাদনই সে সমস্ত দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং মজুরীর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উন্নত দেশসমূহেও ভূমির অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত রাশিয়া, হল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ভূমি এখনও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। এমনকি শিল্পোন্নত আমেরিকাও শুধু সে দেশের জনগণের খাবারেরই ব্যবস্থা করে না অধিকন্তু এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের জনগণের এক বৃহত্তর অংশের খাবারও যোগায়। প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল বিপ্লবের পূর্বে প্রত্যেক দেশেই লক্ষ লক্ষ লোক তাদের অর্থনৈতিক সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য ভূমির উপর নির্ভর করত। প্রাক-শিল্পবিপ্লব যুগে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের পরিবর্তে ভূমিকে কেন্দ্র করেই যে কোন দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠতো।[২৮]

ইসলাম-পূর্ব যুগ ও রসূলুল্লাহ স.-এর সময়ের ভূমি ব্যবস্থা

অর্থনৈতিক ও ভূমি সমস্যার সমাধান এবং সকল প্রকার দারিদ্য ও শোষণ-পীড়ন হতে মানব জাতিকে মুক্ত করার জন্য সর্বোপরি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবন গড়ার লক্ষে রসূলুল্লাহ স. আজীবন ছিলেন সচেষ্ট। অর্থ এবং ভূমি মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হেতু রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতিটি দিকের সঠিক সমাধান দিয়ে গেছেন। তাঁর সময়ে

www.pathagar.com

ইসলামের আর্থিক এবং ভূমি বিধান যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে যে সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির সূচনা হয়েছিল তা গোটা বিশ্বের জন্য অনুসরণযোগ্য উদাহরণ।

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবদের ভূমি ব্যবস্থা

ইসলামের সূতিকাগার আরব উপদ্বীপ। প্রাচীনকাল থেকেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূখন্ড হিসাবে স্বীকৃত। এর অবস্থান তিনটি মহাদেশের সঙ্গমস্থলে। সে কারণে ইতিহাসের সেই অজ্ঞাত যুগ হতে চীন, ভারত প্রভৃতি প্রাচ্যদেশ থেকে যেসব বাণিজ্য সামগ্রী ইউরোপীয় দেশসমূহে রফতানী হতো, তা ইরাক সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের উপর দিয়েই বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। এ বাণিজ্য কাফেলা তায়েফ, মক্কা ও মদীনা স্পর্শ করে অগ্রসর হতো। আর হিজাজের মক্কাই ছিল প্রাচীন এ বাণিজ্য পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

এই মক্কা উপত্যকাতেই হযরত ইব্রাহীম আ. মহান আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। যুগ যুগ থেকে হজ্জ উপলক্ষে সেখানে আসতে থাকে হাজার হাজার মানুষ। এখান থেকে ইসলামের শান্তির বাণী প্রচারিত হয় সর্বপ্রথম। এই মক্কার হেরা গুহাতেই নাযিল হয়েছিল কুরআনুল কারীম। আরব উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সিরিয়া ও ফিলিস্তিন হচ্ছে বিশ্বের আরও দু'টি বড় ধর্মমত–ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্মের উৎস ভূমি।[২৯]

প্রাক ইসলামী যুগকে 'আইয়্যামে জাহেলিয়া'[৩০] বা অন্ধকার যুগ বলা হয়। এ যুগে আরব জাতির ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে চরম অধঃপতন ঘটে। তবে রসূলুল্লাহ স.-এর জন্মের প্রাক্কালে উত্তর ও দক্ষিণ আরবে সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের অভ্যুদয় হলেও মধ্য আরবের হিজাজ ও নাজ্দ প্রদেশ এবং নুফুদ অঞ্চল ছিল মরুবাসী যাযাবর বেদুঈনদের প্রশস্ত বিচরণ ক্ষেত্র। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গোত্র-কলহে লিপ্ত বেদুঈনগণ আধুনিক অর্থে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারেনি। আরববাসী বলতে সমগ্র আরব উপদ্বীপের অধিবাসীকে বুঝায়। কিন্তু প্রাক-ইসলামী যুগের আরব বলতে সাধারণত হিজাজ ও পার্শ্ববর্তী অনুন্নত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন অঞ্চলকেই বুঝায়। এ কারণে অন্যান্য এলাকার তুলনায় ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে হিজাজে শোচনীয় ও নৈরাজ্যজনক পরিবেশ বিরাজমান ছিল। এখানে সুস্থ ও উন্নত জীবনযাত্রা, সুসংহত ও সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা, নীতি ও মানবতাবোধ, ধর্মীয় চেতনার অভাব এবং সর্বোপরি অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবস্থা ছিল পশ্চাদপদ।[৩১]

রসূলুল্লাহ স.-এর নবুওয়ত লাভের পূর্ববর্তী সময় ভূমির মালিকের সাথে কৃষকের সম্পর্ক কিরূপ ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। তৎকালীন ভূমির মালিক এবং কৃষকের মধ্যকার সম্পর্ক, তাদের পারস্পরিক অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করার মত উপাদান দুর্লভ। যতটুকু জানা যায়, সেকালে মালিক-কৃষকের

www.pathagar.com

সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না।[৩২] কৃষক চাষাবাদের বিনিময়ে ভূমির মালিককে কি দিবেন, সেকালে তা পূর্বে ঠিক করা হত না; ভূমির খাজনা জাতীয় কিছু নির্দিষ্টও ছিল না।[৩৩] তৎকালে প্রচলিত মালিক-কৃষক বা মালিক-প্রজা সম্পর্কীয় ব্যবস্থাকে 'মুযারা'আ' বলা হতো। এ ব্যবস্থার অন্যান্য আরও কিছু নাম রয়েছে, যেমন ঃ 'মুখাবারা', অথবা 'খিবর' বা 'মুহাকালা'।[৩৪]

ইসলাম-পূর্ব যুগে মালিক এবং কৃষকের সম্পর্ক পারস্পরিক চুক্তিভিত্তিক ছিল না; প্রথা এবং ঐতিহ্য এদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতো। কৃষক যে শর্তে জমি চাষ করতেন, সে শর্তের ভিত্তি ছিল প্রথা ও ঐতিহ্য। এ প্রথা ও ঐতিহ্য সামাজিক অবস্থার দ্বারা নির্মিত এবং নিয়ন্ত্রিত হতো। মালিক এবং কৃষকের আর্থিক অবস্থার মধ্যে নিদারুণ বৈষম্য ছিল, সে বৈষম্যের কারণে মালিক এবং কৃষকের সম্পর্ক স্বাধীন চুক্তিভিত্তিক হতে পারেনি। মালিকের প্রস্তাব এবং কৃষকের সম্মতি অথবা কৃষকের প্রস্তাব এবং মালিকের সম্মতি এভাবে দু'পক্ষের মধ্যে নিরপেক্ষ চুক্তি হওয়া সে সময় সম্ভব ছিল না। সেকালে জমি চাষ করার ব্যাপারে মালিক এবং কৃষকের কতটুকু অধিকার ও দায়িত্ব ছিল তা তৎকালে প্রচলিত কোন আইন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেনি।[৩৫]

তৎকালীন প্রচলিত কিছু পদ্ধতি

মুহাকালা

* মুহাকালা হচ্ছে ক্ষেতের শস্য নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা।[৩৬]
* ইমাম মালিক র. বলেন, শস্যের বিনিময়ে ভূমিকে অন্যের কাছে ইজারা দেয়াকে মুহাকালা বলে।[৩৭]
* মুহাকালা এক রকম ভূমির বর্গা ইজারা-এতে উৎপন্ন ফসলের একভাগ মালিক পায়।[৩৮]
* ক্ষেতের কাঁচা ফসল বা গাছের অপাকা ফলকে শস্যের বিনিময়ে খরিদ করাকে মুহাকালা বলা হয়।[৩৯]

এ ছাড়াও মুহাকালার চারটি পরিচয় রয়েছে–

১. দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে ক্ষেতের বা গাছের অপাকা ফসল ও ফল লেনদেনকে মুহাকালা বলে।
২. পাকা ফসলের বিনিময়ে অপাকা শস্য ক্রয়কে মুহাকালা বলে।
৩. উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ পাবার চুক্তিতে মালিক কৃষকের বরাবরে ভূমি বর্গা দেয়ার যে চুক্তি, তাকে মুহাকালা বলে।
৪. ফসল প্রাপ্তির অঙ্গীকারে ভূমি ইজারা দেয়াকে মুহাকালা বলে।[৪০]

তৎকালে মূলত মুহাকালা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সে যুগে যারা ভূমিহীন ছিল তারা ভূমির

www.pathagar.com

মালিকের কাছ থেকে বিভিন্ন শর্তে আবাদযোগ্য ভূমি চাষাবাদ করত। সুযোগ বুঝে ভূমির মালিক বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দিত। কখনও কখনও নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য দেয়ার শর্ত থাকত। জমির মালিকগণ শক্তিশালী ছিলেন এবং কৃষকদের প্রতিকূলে অনেক সময় তাদের শক্তির অপব্যবহার করতেন। কৃষককূল দরিদ্র ও শক্তিহীন ছিল বিধায় মালিকদের সাথে তাদের ইজারা বা বর্গা চুক্তি কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতিতে হত, না-হত, শক্তিধর মালিকের খেয়াল খুশিমত।[৪১]

মুখাবারা পদ্ধতি

ইসলাম পূর্ব যুগে আরব দেশে কৃষক-মালিক সম্পর্কীয় 'মুখাবারা' বা 'খিবর' নামে অপর আর একটি পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

* মুখাবারা এক প্রকার ভাগ বর্গা চুক্তি। বর্গাদার মালিককে এ চুক্তির ভিত্তিতে উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ দেয়। এ শব্দটি 'খায়বার' শব্দ হতে উদ্ভূত হতে পারে। ইহুদীগণ মুসলমানদের দ্বারা পরাজিত হবার পর ইহুদী কৃষক এবং মুসলমান ভূমি মালিকদের মধ্যে অর্ধেক শস্যের বিনিময়ে জমি চাষাবাদ করার জন্য খায়বারে যে চুক্তি হয়েছিল, সে চুক্তির অনুকরণে এই চুক্তিকে 'মুখাবারা' বলা হয়ে থাকতে পারে।[৪২]
* কুয়া এবং কৃষিকাজ সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে, আরবী ভাষায় তাকে 'খবির' বলে। 'খবির' থেকে 'মুখাবারা' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।[৪৩]
* কোন ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তিকে এ শর্তে ভূমি চাষাবাদ করার জন্য দেয় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি ভূমিটি চাষ করবে এবং অবশেষে উৎপন্ন শস্যের একটি অংশ প্রথম ব্যক্তিকে দিবে-এ চুক্তিকে মুখাবারা বলা হয়।[৪৪]

রসূলুল্লাহ স. জাহেলী যুগ হতে চলে আসা মুহাকালা এবং মুখাবারা পদ্ধতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, সে সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ

* হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. মুখাবারা, মুহাকালা, মুযাবানা এবং খাবার উপযোগী হবার পূর্বে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।"[৪৫]
* হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত রা. বলেন, 'রসূলুল্লাহ স. মুখাবারা করতে নিষেধ করেছেন।'[৪৬]
* হযরত জাবির ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে ঃ যে ব্যক্তি মুখাবারা ত্যাগ করে না, সে যেন আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখে।"[৪৭]

মুহাকালা, মুখাবারা বা মুযারা'আ প্রকৃতপক্ষে একই বস্তু। যে সব লেনদেনের মধ্যে অনিশ্চয়তা বিদ্যমান কিংবা যেগুলোর মধ্যে ঝুকি ভাব থাকে, যেগুলোর আকৃতি জুয়া

www.pathagar.com

বা ফটকাবাজির মত-মূলত সে সব লেনদেন এবং চুক্তি কারবার এ শ্রেণীর আওতায় পড়ে। ইমাম শাফিঈ র. বলেন, 'এক ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তিকে চাষাবাদ করার জন্য এ শর্তে জমি দেয় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি জমি চাষ করবে এবং উৎপন্ন শস্যের একটি অংশ প্রথম ব্যক্তিকে দেবে-সে প্রেক্ষিতে ঐ সব চুক্তিকে রসূলুল্লাহ স. নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।'[৪৮]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বকার সময়ে ভূমি চাষাবাদের ক্ষেত্রে কৃষককুলের অবস্থা সার্বিকভাবে ভাল ছিল না। তৎকালীন সমাজে যারা চষাবাদের কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাদের বলা হত 'ফাল্লাহূন' [চাষী], মুজারি'উন [প্রজা বা বর্গাদার], আককারুন [ক্ষেত-মজুর] এবং 'উলুজ [দাস-প্রজা]। ইতিহাস তাদের সম্পর্কে প্রায় নীরব। একথা সত্য যে, তারাই সমাজে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং রাষ্ট্রীয় আয়ের বৃহদংশ তারাই সরবরাহ করতেন। তবুও সামাজিক মর্যাদায় তাদের স্থান ছিল নীচে এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা ছিলেন নিম্নস্তরে। রসূলুল্লাহ স. নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তাদের এই দুঃসহ পরিস্থিতির অবসান ঘটে।[৪৯]

মদীনায় আগমনের পর রসূলুল্লাহ্ স.-এর ভূমি প্রাপ্তি ও বণ্টন পদ্ধতি

ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উত্তরাধিকারকে স্বীকার করলেও জনগণের বৃহত্তর কল্যাণে ভূমিকে জাতীয় সম্পদ বলে মনে করে। কেননা 'ভূসম্পদ কোন লোক বিশেষ বা জাতি বিশেষের শ্রমের ফল নয় ভূমি মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি সর্বজনীন সম্পদ যার মধ্যে জাতির প্রতিটি লোকেরই অধিকার রয়েছে। রসূলুল্লাহ স. তাঁর জীবনে এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে ছিলেন। নবুওয়ত প্রাপ্তির পর রসূলুল্লাহ সা. মক্কাবাসীর সাহায্য সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে মদীনায় হিজরত করে এসে কুবাতে কুলসুম ইব্‌নুল হিদম রা.[৫০] -এর বাড়ীতে মেহমানরূপে অবস্থান করেন। এ সময় রসূলুল্লাহ স. একটি মসজিদ নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রসূলুল্লাহ স.-এর ইচ্ছা পূরণে কুলসুম ইব্‌নুল হিদম রা. প্রস্তাবিত মসজিদের জন্য কিছু জায়গা তাঁকে উপহার দেন।[৫১] উম্মে আনাস নাম্মী একজন আনসারী মহিলা তাঁর ভূ-সম্পদ রসূলুল্লাহ স.-কে উপহার দিলে তিনি নিজের ধাত্রী উম্মে আয়মান[৫২]কে তা প্রদান করেন।[৫৩] বিশাল ভূ-সম্পদের অধিকারী হারিসা ইব্‌ন নু'মান[৫৪] রা. নিজের কয়েকটি ঘর ও ভূ-সম্পদ রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবীদের উপহার দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও একটি বাড়ী উপহার দিয়েছিলেন হযরত ফাতিমা[৫৫] রা.-কে ২ হিজরী/৬২৪ সালে তাঁর বিয়ে উপলক্ষে।[৫৬]

বনূ নযীর[৫৭] গোত্রের সম্পদশালী মুখায়রিক রা. ওহুদ যুদ্ধের পর রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে নিজের ভূসম্পত্তি ও খেজুর বাগিচা সমর্পণ করেন। তার বাগিচা ছিল সাতটি।[৫৮] আল-ওয়াকিদী[৫৯] সেগুলোর নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন, আল মিসাব, আস-

www.pathagar.com

সাফিয়াব, আদ-দালাল, হুসনা, বুরকা আল আওয়াফ এবং মাশরাবা 'উম্মে ইবরাহীম। মুহাজিরগণও ভূসম্পত্তি বিশেষ করে কূয়া দান করেছিলেন। হযরত 'উছমান রা. জনগণের কল্যাণের জন্য রুমার কূপটি দান করেছিলেন, যা মদীনার সবচেয়ে মিষ্টি পানির কূপ ছিল। এ কূপটি ছাড়াও তিনি আরও অন্যান্য কূপও দান করেছিলেন। অন্যান্য ধনী ও দানশীল সাহাবাও জনসাধারণের কল্যাণের জন্য আরও ভূ-সম্পদ ও কূপ দান করেছিলেন।[৬০]

রসূলুল্লাহ স. ৬১০ সনে যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন তিনি ইহুদীদের সাথে এই শর্তে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন যে, যদি কোন শত্রুপক্ষ মদীনায় মুসলিমদের আক্রমণ করে, তবে উভয় গোত্রই সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করবে এবং মুসলিম ও ইহুদীগণ স্ব স্ব ব্যয়ভার বহন করবে।[৬১] কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায় কৃত চুক্তি অক্ষুন্ন রাখতে ব্যর্থ হয়। চুক্তি ভঙ্গের কারণে বিভিন্ন ইহুদী গোত্রের কাছ থেকে যেভাবে ভূসম্পদ পাওয়া গিয়েছিল তার বিবরণ উপস্থাপিত হল।

বনূ কায়নুকার[৬২] ভূসম্পত্তি

বনূ কায়নুকা হচ্ছে প্রথম ইহুদী গোত্র, যারা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে। তারা কেবল চুক্তিতে বর্ণিত তাদের দায়িত্ব পালনেই অবহেলা করেনি উপরন্তু আগ্রাসীদের মতো আচরণ করেছিল। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের কারণে বনূ কায়নুকার ইহুদীরা তাদের উপর রুষ্ট হয় ও হিংসা পোষণ করে এবং তাদের এই মনোভাব প্রকাশ্য বৈরিতায় রূপান্তরিত হয়। ফলে রসূলুল্লাহ স. বনূ কায়নুকা গোত্রকে অবরোধ করেন। দ্বিতীয় হিজরীর জিলকদ মাস শুরুর পূর্ব পর্যন্ত ১৫ দিন ধরে অবরোধ বলবৎ থাকে। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ আরও কঠোর করলে তারা রসূলুল্লাহ স.-এর দেয়া রায় মেনে নিতে সম্মত হয়। রসূলুল্লাহ স. প্রদত্ত রায়ে বলা হয়, তিনি বনূ কায়নুকার সম্পত্তি গ্রহণ করবেন তবে তারা তাদের গোত্রের নারী ও শিশুদেরকে নিজেদের সাথে রাখতে পারবে। তিনি তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দেন এবং তা কার্যকর করার দায়িত্ব দেন উবায়দা ইব্‌ন আল সামিত রা.-এর উপর। তাদের সম্পদ আটক করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা আল আনসারী রা.-এর উপর। বনূ কায়নুকার বহিষ্কার সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়ঃ

'যারা কুফরী করে তাদের বলো তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে একত্র করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। দুইটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল, অন্যদল কাফের ছিল; তারা তাদেরকে চোখের

www.pathagar.com

দেখায় দিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রয়েছে।'[৬৩]

অনেক মুফাসসিরে কুরআন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, নিম্নের আয়াতটিও বনূ কায়নুকার মিত্র আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উবাই[৬৪] সম্পর্কে নাযিল হয় ঃ

'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।'[৬৫]

বিজয়ী হয়ে মুসলমানগণ বনূ কায়নুকার ভূসম্পত্তি অর্জন করেন।[৬৬] বনূ কায়নুকার সম্পদ দ্বারা মুসলিমগণ, বিশেষ করে মুহাজিরগণ অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন।[৬৭] বনূ কায়নুকার পেশা ছিল স্বর্ণকার, তাদের বাজারটি ছিল মদীনার সবচেয়ে বড় বাজার। দোকান ও বাড়ী ছিল তাদের উপার্জনের উৎস। বিজয়ের পর সেগুলো মুসলমানদের করায়ত্ত হয়।[৬৮]

বনূ কায়নুকার সম্পদের সঠিক মূল্য কত ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ তথ্য-উৎস গ্রন্থে তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৬৯]

বনূ নযীর

বনূ কায়নুকার ন্যায় ইহুদী গোত্র বনূ নযীরও রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে চুক্তি ভংগ করে।[৭০] ফলশ্রুতিতে রসূলুল্লাহ স. হিজরী চতুর্থ বর্ষে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।[৭১] আল-ওয়াকিদী ও ইব্‌ন সা'দ র. বর্ণনা করেন যে, হিজরতের ৩৭তম মাস রবিউল আওয়ালে এই অভিযান চালানো হয়।[৭২] ইব্‌ন হিশামও রবিউল আওয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হবার প্রশ্নে তাদের সাথে একমত পোষণ করেন।[৭৩]

অভিযানের কারণ

বদরযুদ্ধের পর বনূ নযীর রসূলুল্লাহকে স. হত্যার চক্রান্ত করে। বিভিন্ন সূত্রে দু'টি চক্রান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. কুরাইশরা বনূ নযীরকে লেখা একটি চিঠিতে হুমকি দেয় যে, তারা যদি রসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে তাহলে তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে। এর পর বনূ নযীর তাদের প্রথম চক্রান্ত শুরু করে। তারা তাদের দূরভিসন্ধি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বিশ্বাসঘাতকতার পন্থা বেছে নেয়। তারা প্রস্তাব রাখে যে, রসূলুল্লাহ স. ৩০ জন সাহাবাসহ মদীনার কেন্দ্রস্থলে আসবেন, অনুরূপভাবে ইহুদীরা সমসংখ্যক ইহুদী পন্ডিত নিয়ে তথায় সমবেত হয়ে রসূলুল্লাহর স. কথা শুনবে এবং তারা তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলে সকল ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করবে। তিন জন ইহুদী পন্ডিত ছুরি বহন করছিল, কিন্তু একজন ইহুদী মহিলা ইসলাম গ্রহণকারী তাঁর ভাইয়ের কাছে

www.pathagar.com

তাদের চক্রান্তের কথা জানিয়ে দিলে তিনি রসূলুল্লাহকে স. তা অবহিত করেন, ফলে রসূলুল্লাহ স. তাদের সাথে সাক্ষাৎ না করেই ফিরে আসেন। রসূলুল্লাহ স. মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি ইহুদীদের গিয়ে বল, যেহেতু তোমরা আমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছ তাই আমাদের এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও'।[৭৪] ইহুদীরা এ নির্দেশ অমান্য করে। এ কারণে রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবাগণ রা. বনূ নযীরকে ১৫ দিন ঘেরাও করে রাখেন। শেষ পর্যন্ত তারা রসূলুল্লাহ স.-এর রায় মেনে নেয় এবং এই শর্তে আপোষ মিমাংসা করে যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে না, বরং বাসগৃহ এবং জমিজমা থেকে তাদেরকে বেদখল করে সিরিয়া নির্বাসন দেয়া হবে।[৭৫] রসূলুল্লাহ স. তাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, ফলে তারা চলে যাবার সময় ঘরের দরজা পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে যায়।[৭৬]

২. ইব্‌ন ইসহাক তাদের দ্বিতীয় চক্রান্তের কথা বর্ণনা করেন। অধিকাংশ সীরাত রচয়িতা তাঁকে অনুসরণ করেছেন। চুক্তির শরীক একটি গোত্রের দু'ব্যক্তির রক্তের মূল্য পরিশোধে সাহায্যের অনুরোধ জানাতে রসূলুল্লাহ স. বনূ নযীর গোত্রের কাছে যান। রসূলুল্লাহ স. বনূ নযীর গোত্রের কাছে যেয়ে একটি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেন, এ সময় তারা উপর থেকে একটি বড় পাথর রসূলুল্লাহ স.-এর উপর ফেলে তাঁকে হত্যা করতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি মহান আল্লাহর কাছ থেকে এই চক্রান্তের বিষয় জানতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করে মদীনায় ফিরে আসেন। মদীনায় ফিরেই তিনি তাদেরকে অবরোধ করার নির্দেশ দেন। ছয় দিন অবরুদ্ধ থাকার পর তারা তাদের উটগুলো যে পরিমাণ মালামাল বহন করতে পারবে তা নিয়ে চলে যাওয়ার শর্তে একটি শান্তি চুক্তিতে সম্মত হয়।[৭৭]

বনূ নযীরের প্রতি রসূলুল্লাহ স.-এর বহিষ্কারাদেশ

আল ওয়াকিদী র. বলেন, রসূলুল্লাহ স. ১০ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বনূ নযীরকে নির্দেশ দেন এবং বলেন, এরপরও যারা থাকবে তাদের শিরোচ্ছেদ করা হবে। তারা চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উবাই ইব্‌ন সলুল তাদেরকে বিদ্রোহ ঘোষণা ও অবস্থান করার জন্য উস্কানী দেয় এবং নিজে তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। বনূ নযীর বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাদেরকে অবরোধ করেন।[৭৮]রসূলুল্লাহ সা. বনূ নযীরকে অবরোধ করার পর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমরা আমার সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন ও তা মেনে চলার ওয়াদা না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিব না।' তারা তার সঙ্গে চুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাই রসূলুল্লাহ স.-এর নেতৃত্বে সাহাবাগণ অস্ত্র ছাড়া উটে বহনযোগ্য সামগ্রী নিয়ে চলে যাওয়ার শর্ত সাপেক্ষে বহিস্কৃত হতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত দিনভর

www.pathagar.com

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। পরবর্তীতে চুক্তি মেনে নিয়ে বনূ নযীরের লোকেরা বাড়ী ফিরে ঘরের দরজাসহ যতদূর সম্ভব জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায়। তারা তাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে মূল্যবান কাঠগুলোও নিয়ে যায়।[৭৯]

রসূলুল্লাহ স. বনূ নযীরের অবরোধকালে তাদের কিছু সংখ্যক খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলেন ও পুড়িয়ে দেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে ঃ

'তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহর অনুমতিক্রমেই; এবং এ জন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।'[৮০]

তাদেরকে সিরিয়ায় বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং তাদের কিছু সংখ্যক খায়বারে যেয়ে বসতি গড়ে তুলেছিল।[৮১] বনূ নযীর গোত্রের যে দু'জন মুসলমান হয়েছিলেন তারা তাদের সম্পত্তি নিজেদের অধিকারে রেখেছিলেন। তারা হলেন, ইয়ামিন ইব্ন 'উমার ইব্ন কা'ব এবং আবূ সা'দ ইব্ন ওহাব।[৮২]

বনূ নযীরের বহিষ্কারের মাধ্যমে মুসলমানরা শক্তিশালী হয় এবং তাদের জমিজমা থেকে সাহাবীগণ সুফল লাভ করেন।

বনূ নযীরের ভূসম্পত্তি

বনূ নযীরের সহায় সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল খেজুর বাগান, মাঠ এবং বসবাসের কিল্লা।[৮৩] খেজুর গাছের নীচে বৃহদাকার কৃষিভূমি (আয-যারুল কাসির) ছিল।[৮৪] রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ অনুযায়ী বনূ নযীর তাদের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি উটের পিঠে করে নিয়ে যায়। তারা তাদের ঘর-দরজা, এমন কি চৌকাঠ পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারা প্রথমে খায়বর, অতঃপর সেখান থেকে সিরিয়া চলে যায়। বনূ নযীর তাদের ছেলে-মেয়ে এবং আসবাব সামগ্রী উটের পিঠে করে নিয়ে যায়। তাদের সাথে তবলা, সেতার এবং নর্তকীরাও ছিল, তারা তাদের পিছনে গান গেয়ে এবং বাজনা বাজিয়ে চলছিল।[৮৫]

বনূ নযীরের ভূ সম্পত্তি সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে ঃ

'আল্লাহ ইহুদীদের নিকট হতে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ কর নি; আল্লাহ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[৮৬]

ভূসম্পত্তির উপর একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ স. তা নিজের দখলে না রেখে মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। সাহল ইব্ন হুনাইফ এবং আবূ দুজানা নামক দু'জন আনসারী সাহাবীর অভাব-অনটন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-কে অবহিত করা হলে তিনি তাদেরও উক্ত সম্পত্তির একটি অংশ দিয়েছিলেন।[৮৭] সাতটি

www.pathagar.com

বাগান ছাড়া আর সকল ভূ-সম্পদই বিতরণ করে দেওয়া হয়েছিল।[৮৮] বনূ নযীর হতে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ ও জমি মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ায় আনসারদের উপর তাদের ভরণ-পোষণের ভার লাঘব হয়েছিল।[৮৯]

এই সকল মাল সম্পদ থেকে যে সকল ভূসম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল সেগুলোর যে বিবরণ ওয়াকেদী প্রদান করেছেন, তা থেকে সেগুলোর ধরণ এবং মূল্য সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। হযরত আবূ বকর এবং হযরত 'উমর রা. পেয়েছিলেন যথাক্রমে বি'রে (কূপ) হিজর ও বি'রে জারাম। আর আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ রা. পেয়েছিলেন সু'য়ালা, যা মালে সুলায়েম নামে পরিচিত ছিল। সুহায়েব ইব্‌ন সিনান রা. পেয়েছিলেন আয-যারাতা, আর যুবায়ের ইবনুল আওয়াম এবং সালামা ইব্‌ন 'আবদুল আসাদ রা. উভয়ে আল-বুওয়াইলা ভাগ করে নিয়েছিলেন। সহল ইব্‌ন হুনায়েফ এবং আবূ ইব্‌ন 'আবদুল আসাদ রা. উভয়ে আবু দু'জনার মালকে ভাগ করে নিয়েছিলেন। আবূ দুজানার রা. মালকে বলা হত ইব্‌ন খারাশাহ-এর মাল।[৯০]

ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ বনূ নযীরের যে ভূসম্পদ পেয়েছিলেন, তা পরে তিনি তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান রা.-এর নিকট চল্লিশ হাজার দীনারে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।[৯১]

বনূ কুরায়জা[৯২]

অভিযানের তারিখ ও কারণ

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হবার পর যিলকদ মাসের শেষে অথবা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিকে বনূ কুরায়জা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়।[৯৩] রসূলুল্লাহ স. সাহাবীদেরকে সরাসরি বনূ কুরায়জার এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, মহান আল্লাহ্ ওদের শক্ত ঘাঁটি তছনছ করা এবং ওদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য জিব্রাঈলকে আ. পাঠিয়েছেন। তিনি বনূ কুরায়জার এলাকায় পৌঁছেই সকলকে আসরের নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেন। আসরের নামাযের সময়ও অনেকে বনূ কুরায়জার এলাকায় যাবার পথে ছিলেন, তাই তাদের কেউ কেউ নামাজ আদায় করলেন বাকীরা বিলম্বে নামাজ পড়লেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ স. কাউকে তিরষ্কার করেননি। কারণ সকলেই তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে কাজ করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।[৯৪]

রসূলুল্লাহ স. তাঁর অনুপস্থিতিতে মদীনা শাসনের জন্য আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাকতুমকে মদীনার শাসক নিয়োগ করে বনূ কুরায়জার এলাকায় যান এবং তাদের অবরোধ করেন।[৯৫]

www.pathagar.com

অবরোধের সাফল্য ও বনূ কুরায়জার পরিণাম

বনূ কুরায়জার বিরুদ্ধে অবরোধ কঠোর করা হলো। অবরোধ তাদের জন্যে অসহনীয় হয়ে উঠলো। তারা আত্মসমর্পণ করতে চাইলো এবং তাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. যে রায় দেবেন তা মেনে নিতে তারা সম্মত হলো। তারা রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবী ও তাদের মিত্র আবূ লুবাবা ইব্ন আব্দুল মুনজিরের সঙ্গে পরামর্শ করলো। তিনি তাদেরকে আভাস দিলেন যে তারা আত্মসমর্পণ করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এই কথা বলার জন্য আবূ লুবাবা অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন এবং তার তওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে মসজিদে নববীর একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখেন।[৯৬]

বনূ কুরাইজা হযরত সা'দ ইব্ন মু'য়াজ রা.-এর সালিশ মেনে নিতে সম্মত হলো। তারা আশা করেছিল যে তাদের ও তার নিজ গোত্র আওয়াসের লোকদের সঙ্গে মিত্রতার কারণে ইবনে মুয়াজ তাদের প্রতি সদয় হবেন। খন্দকের যুদ্ধে হাতে তীরবদ্ধ হয়ে আহত হওয়ার কারণে হযরত সা'দ ইব্ন মু'য়াজ রা. অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে বনূ কুরায়জার লোকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি রায় দিলেন যে, যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে এবং তাদের সম্পত্তি বণ্টন করে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ স. এই রায় অনুমোদন করে বললেন ঃ 'তুমি মহান আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী রায় দিয়েছ।'[৯৭] এই রায় প্রদানের মাধ্যমে হযরত সা'দ ইব্ন মু'য়াজ রা. বনূ কুরায়জার সাথে তাঁর মৈত্রী চুক্তি ছিন্ন করেন। বনূ কুরায়জার সাথে মৈত্রী চুক্তি বিদ্যমান থাকা এবং অতি সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই রায় আওয়াস গোত্রকে মোটেই বিচলিত করলো না। তাদের নেতা হযরত সা'দ ইব্ন মু'য়াজ রা. বনূ কুরায়জার প্রতি এই রায় দেয়ায় তারা নির্দ্বিধায় এই রায় মেনে নেয়। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ৪০০।[৯৮]

বনূ কুরায়জাকে তাদের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হয়। কারণ তারা মুসলমানদেরকে হত্যা, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন এবং নারী ও শিশুদের বন্দী হওয়ার মতো বিপন্ন অবস্থার মধ্যে নিপতিত করেছিল। তারা তাদের কৃতকর্মের জন্যই উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছিল।

বনূ কুরায়জার ভূসম্পত্তি

বনূ কুরায়জার ভূসম্পদ সম্পর্কে জানা যায় তাদেরও কেল্লা ছিল, খেজুর বাগিচা এবং চাষাবাদের জমি ছিল।[৯৯] ইয়াহইয়া ইব্ন আদম র. বলেছেন, তাদের মাহরুয নামক একটি উপত্যকা ছিল, তা মদীনার হাররা বা লাভা ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল। এখানে চাষাবাদের বড় বড় মাঠ ছিল।[১০০]

বনূ কুরায়জার ধন-সম্পদ রীতি অনুযায়ী পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং প্রতিটি ভাগ সমান ছিল। এক-পঞ্চমাংশ দেয়া হয়েছিল খুমুস অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এবং বাকী অংশ সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করা হয়েছিল।[১০১]

www.pathagar.com

খায়বার[১০২] বিজয়

খায়বার হচ্ছে একটি কৃষি মরুদ্যান। স্থানটি মদীনা থেকে ১৬৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৮৫০ মিটার। খায়বারের জমি অত্যন্ত উর্বর। পানির কোন অভাব নেই। তাই এখানে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল উৎপাদিত হয়, এছাড়া বিপুল পরিমাণ খেজুর গাছের জন্যও স্থানটি বিখ্যাত। খায়বারের বাজার এলাকার নাম ছিল সুক আল নাতাহ। খায়বর বিজয়ের পূর্বে সেখানে আরব ও ইহুদীদের মিশ্র বসতি ছিল। রসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে মদীনা থেকে ইহুদীদের বহিষ্কার করার পর খায়বরে ইহুদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[১০৩]

বনূ নযীরের নেতৃবৃন্দ খায়বারে বসতি স্থাপন করার পূর্বে সেখানকার ইহুদীরা মুসলমানদের প্রতি কোনরূপ শত্রুতা পোষণ করেনি। বনূ নযীরের নেতৃবৃন্দ তাদের মদীনার বাড়ীঘর থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কারণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। স্বপরিবারে সম্পদসহ মদীনা ত্যাগ করার কারণে তাদের আকাশচুম্বী গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পাচ্ছিল।[১০৪]

খায়বারে বসতি স্থাপনকারী বনূ নযীরের সবচেয়ে প্রভাবশালী লোকদের অন্যতম ছিল সালাম ইব্‌ন আব্দুল হাকীক, কিনানা ইব্‌ন আব্দুল হাকীক এবং হুয়াঈ ইব্‌ন আখতাব। তারা খায়বার যাওয়ার পর সেখানকার লোকেরা তাদের নেতৃত্ব মেনে নেয়।[১০৫]

মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের যুদ্ধে খায়বারের ইহুদীদের জড়িত করার জন্য এই তিন ব্যক্তির নেতৃত্বই যথেষ্ট ছিল। তারা খন্দকের যুদ্ধের সময় প্রথম বৈরিতা শুরু করে। বনূ নযীরের নেতাদের নেতৃত্ব খায়বারের ইহুদীরা কুরাইশ ও অন্যান্য আরব বেদুঈন গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করে এ জন্য তারা অর্থও ব্যয় করে। এরপর তারা মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে এবং তাদের সহযোগিতা করতে বনূ কুরায়জাকে সম্মত করায়।[১০৬]

মহান আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানগণ মদীনা রক্ষা এবং আক্রমণকারী গোত্রগুলোকে পরাজিত করার পর রসূলুল্লাহ স. খায়বরের ইহুদীদের কুরাইশ ও অন্যান্য আরব বেদুইন গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করায় তাদের মোকাবেলা করা জরুরী বলে অনুভব করেন, কারণ খায়বার মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।[১০৭]

অভিযানের তারিখ ও খায়বার বিজয়ের বিবরণ

আল ওয়াকিদীর মতে ষষ্ঠ হিজরীর জিলহজ্ব মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে ফেরার পর সপ্তম হিজরীর সফর অথবা রবিউল আউয়াল মাসে তা সংঘটিত হয়।[১০৮] আল জুহ্‌রী ও ইমাম মালিক মনে করেন যে, ষষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বার অভিযান পরিচালিত হয়।[১০৯]

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ সা.-এর নেতৃত্বে মুসলমানগণ ঈমানী শক্তি ও জিহাদের সুউচ্চ মনোবল নিয়ে লোক ও অস্ত্র বলে বলিয়ান হয়ে সুরক্ষিত ও রসদ সম্ভারে পরিপূর্ণ ঘাটিগুলোর দিকে অগ্রসর হয়ে সর্বপ্রথম নাতাহ নামক স্থান জয় করেন। মুসলমানদের হাতে সেখানকার দু'টি শক্ত ঘাটি নায়ীম ও আল সাবেরের পতন ঘটে। তারপর তিনি আল শিক দখল করেন। সেখানকার দু'টি শক্ত ঘাঁটি আবি ও আল নিজার মুসলমানদের হস্তগত হয়। এরপর তিনি কিতাবা জয় করেন। আল কামুস-এর পতন ঘটিয়ে তিনি আল ওয়াসিহ ও আল সালালিম জয় করেন এবং সেখানকার দুর্গগুলো মুসলমানদের করতলগত হয়।[১১০]

রসূলুল্লাহ স. ফজর হবার পূর্বেই খায়বর পৌঁছান এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ফজরের নামায আদায় করেন। সূর্যোদয়ের পর যখন ইহুদী কৃষকরা গবাদী পশু, কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে কাজের জন্য বাড়ী থেকে বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের দেখে, তখন তারা ভয় ও বিস্ময় মিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠলো, সর্বনাশ! মুহম্মদ তাঁর বাহিনীসহ এসে গেছে দেখছি। রসূলুল্লাহ স. জবাবে বললেন, আল্লাহু আকবর, খায়বরের পতন ঘটেছে।

খায়বারের ভূসম্পত্তি

খায়বারেও খেজুর বাগিচা এবং ফসলের ক্ষেত ছিল, সেগুলোতে অন্যান্য ইহুদী উপনিবেশের মত খেজুর গাছের নীচে বিভিন্ন ফসল বপন করা হত।[১১১]

সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে খায়বারের উর্বর অঞ্চল এবং খেজুরের বাগানগুলো রসূলুল্লাহ স.-এর দখলে আসে। খায়বারের অধিবাসীরা কিছুদিন মুসলমানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার পর এই শর্তে আত্মসমর্পণ করে যে, তাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাদের ছেলে মেয়েদেরকেও বন্দী করা হবে না। অবশ্য তারা জমি, সোনা-রূপা এবং অন্যান্য ধন-সম্পদ মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তারা শুধু ঐ সমস্ত মালই সঙ্গে করে নিয়ে যাবে যা তাদের দেহের সাথে রয়েছে।[১১২]

খায়বারের জমিকে ৩৬ ভাগে বিভক্ত করা হয়-যার প্রতিটি অংশ আবার শত অংশে বিভক্ত ছিল। ১৮টি অংশ মুসলমানদের ভাগে পড়ে, যা তারা সমানুপাতিক হারে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। এর একটি সাধারণ অংশ রসূলুল্লাহ স.-এর ছিল। বাকী ১৮ অংশ অতিথি মেহমান এবং রাষ্ট্রদূতদের ব্যয়ভার বহন এবং রসূলুল্লাহ স.-এর অন্য যে সব প্রয়োজন দেখা দিত সেগুলো পূরণের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হতো।[১১৩] জমিগুলো যখন রসূলুল্লাহর স. দখলে আসে তখন শ্রমিকের অভাব থাকায় তিনি সেগুলো আধি হিসাবে (অর্ধেক উৎপাদন মালিকের এবং অর্ধেক উৎপাদন শ্রমিকের) ইহুদীদের দিয়ে দেন। রসূলুল্লাহর স. এই কর্মধারা হযরত আবূ বকরের রা. খিলাফতকালেও বহাল থাকে। হযরত 'উমর রা. যখন খলীফা হন তখন যেহেতু

www.pathagar.com

মুসলমান শ্রমিকের অভাব ছিল না তাই তিনি ইহুদীদেরকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করে সমস্ত ভূসম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।[১১৪]

মুসলিম অংশের ব্যবস্থাপনা ১৮ জন কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত ছিল। তারা প্রত্যেকে ১০০ টি ভাগের দেখাশুনা করতেন। উল্লেখ্য, মুসলিম অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল দু'ভাগের কেল্লার আবাদী ভূমি, সেগুলোর নাম ছিল নাতাত এরং শিক্। নাতাত শাসন করতেন ৫ জন কর্মকর্তা এবং শিক্ শাসন করতেন ১৩ জন কর্মকর্তা।[১১৫] ওয়াকেদী লিখেছেন যে, প্রতি একশ জন লোকের জন্য একজন করে প্রধান থাকতেন, তিনি পরিচিত বা স্বীকৃত ব্যক্তি হতেন, তিনিই নিজের লোকদের মধ্যে দুই দলের যা কিছু উৎপাদিত শস্য পাওয়া যেত তা ভাগ করে দিতেন। প্রধান সর্দারদের মধ্যে মাত্র ১১ জনের নাম ওয়াকেদীর গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে ঃ তারা হলেন-আসিম ইবন আদী, আলী ইবন আবী তালেব, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ, মুয়াজ ইবন জাবাল, উসায়েদ হুযায়র, আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা, ফারওয়া ইব্‌ন আমর, 'উমর ইবনুল খাত্তাব, সা'দ ইবন উবাদা এবং বুরায়দা ইব্‌ন হুসায়েব রা.। তবে শেষোক্ত ব্যক্তি একটি আওসের অংশ, নাম সাহমুল-লাফিফ, ভূমি ক্রয় করেছিলেন এবং সে হিসাবে তিনি একজন কর্মকর্তা হয়েছিলেন।[১১৬] খায়বার থেকে যে খুমুস আদায় হয়েছিল তা তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছিল ঃ একভাগ রসূলুল্লাহ স.-এর পরিবারের, একভাগ বনূ হাশিম এবং বনূ মুত্তালিব গোত্রীয় তার আত্মীয়গণের, তৃতীয় ভাগ অস্বচ্ছল মুসলমানদের জন্য।[১১৭]

ওয়াদিউল কুরার[১১৮] ভূ সম্পত্তি

রসূলুল্লাহ সা. খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ওয়াদিউল কুরায় পদার্পণ করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা এই দাওয়াত অস্বীকার করে রসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অতি সামান্য প্রতিরোধের পরে রসূলুল্লাহ স. যুদ্ধে জয়ী হন এবং ওয়াদিউল কুরার সমস্ত ধন সম্পদ গনীমত হিসেবে লাভ করেন। তিনি এ্ থেকে এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেন এবং শস্য, ক্ষেত ও খেজুর বাগানগুলো তাদের হাতেই রেখে দেন। তিনি তাদের সাথে সেরূপ সমঝোতাই করেন খায়বারবাসীদের সাথে যেরূপ করেছিলেন।[১১৯] ইহুদীগণ খায়বার এবং ফিদকের অনুরূপ শর্তাবলী গ্রহণে সম্মত হলে তখন খেজুর বাগিচাসমূহ ও ভূমি অর্ধেক ভাগের ভিত্তিতে তাদেরকে চাষ করতে দেয়া হয়েছিল।[১২০]

হযরত 'উমর রা. তাঁর খিলাফতকালে ইহুদীদেরকে ওয়াদিউল কুরা থেকে নির্বাসিত করেন। অবশ্য তিনি সেখানকার ভূ সম্পত্তির উচিৎ মূল্য (নয় হাজার দীনার) নির্ধারণ করে তা ইহুদীদের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন।[১২১]

www.pathagar.com

তায়মা-এর[১২২] ভূসম্পত্তি

তাইমা'র ইহুদীগণ খায়বার, ফিদাক এবং ওয়াদিউল-কুরার ইহুদীগণের ভাগ্যের বিষয় অবগত হয়েই জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়েছিল, ফলে তাদের জমি রক্ষা পেয়েছিল।[১২৩] এখানকার ফল-ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার বিষয়ে তদারকী বা অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুসলিম কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে ওয়াদিউল কুরা এবং তাইমাতে যে ওয়ালী (গভর্নর) নিয়োগ করা হয়েছিল তা জানা যায়, নিয়োগ সম্ভবতঃ আত্মসমর্পনের পর পরই হয়েছিল।[১২৪] কাজেই এরূপ ধারনা করলে ভুল হবে না যে,গভর্ণরগণই নিজ নিজ অঞ্চলের খাজনা প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন। মদীনাতে একজন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা ছিলেন, তিনি হিজাযের সকল ফলের পরিমাণের হিসাব রক্ষা করতেন।[১২৫] উল্লেখ্য হযরত 'উমর রা. খায়বার, ফিদক এবং তাইমার বাসিন্দাদেরকে নির্বাসিত করেছিলেন।[১২৬]

তা'ইফ-এর[১২৭] ভূসম্পত্তি

তৎকালীন তায়েফের উপর বনূ আমির গোত্রের আধিপত্য ছিল। তায়েফের প্রতিবেশী এলাকায় সাকীফ গোত্রের বাস ছিল। সাকীফ গোত্রীয় লোকেরা তায়েফে গাছ-পালা এবং ফলমূলের আবাদ ভাল দেখতে পেয়ে বনূ আমির গোত্রকে এ প্রস্তাব দেন যে, 'যেহেতু তায়েফের জমি চাষাবাদের উপযুক্ত এবং এ সব জায়গা শুধুমাত্র পশু চরানোর জন্যই ব্যবহার করা ঠিক নয়, অতএব এখানে কৃষিকাজ হওয়া উচিত এবং সেই কারণে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি আমাদের দায়িত্বে দিয়ে দিন। তারা আরও বললেন, আমরাই চাষাবাদ করব, গাছপালা লাগাবো, কূপ খনন করবো এবং এসব ব্যাপারে আপনাদের কোন পরিশ্রম করতে হবে না। ফল পেকে উঠার পর তখন এর অর্ধ আপনাদের হাতে তুলে দিব এবং শ্রমের বিনিময়ে বাকি অর্ধেকটা আমরা ভোগ করব।' বনূ আমির গোত্রের লোকেরা এ কথায় সম্মত হন এবং নিজেদের জমিগুলো সাকীফ গোত্রের দায়িত্বে দিয়ে দিন। এভাবেই বনূ আমির গোত্রের অধীনে সাকীফ গোত্রের লোকেরা কৃষক হয়ে অর্ধেক উৎপাদনের বিনিময়ে জমি চাষ করতে থাকেন।

বনূ আমির এবং বনূ সাকীফ-এর মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হবার পর বনূ সাকীফ গোত্রের লোক তায়েফের সমস্ত জমি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয় এবং কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করে। তারা আঙ্গুর এবং ফলবান বৃক্ষের চাষ করতে থাকে এবং বনূ আমির গোত্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী অর্ধেক ফসল দিতে থাকে। এমতাবস্থায় আরবের কোন গোত্র সাকীফ গোত্রকে আক্রমণ করলে তাদের জমিদার বনূ আমির সে আক্রমণ প্রতিহত করত। ক্রমান্বয়ে সাকীফ সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকলে তারা তায়েফের সন্নিকটে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। অতঃপর বনূ আমির

www.pathagar.com

গোত্রকে অর্ধেক ফসল দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা তা ভঙ্গ করে। এই দেনা-পাওনাকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াই শুরু হয় এবং পরিণামে বনূ সাকীফ জয় লাভ করে।

মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ স. তায়েফ ঘেরাও করেন এবং পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করেন। কয়েক মাস পর ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে বনূ সাকীফের এক দল প্রতিনিধি মদীনায় আগমন করলে তারা তাদের ভূসম্পত্তি এবং বিষয়-আশয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি পত্র লিখিয়ে নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে প্রতিশ্রুতি পত্র লিখিয়ে দেন। ফলে তারা পুনরায় তাদের ভূসম্পত্তির মালিকানা লাভ করে।[১২৮]

নাজরান[১২৯] এর ভূসম্পত্তি

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর নাজরানবাসী রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এক দল প্রতিনিধি পাঠিয়ে মৈত্রী প্রস্তাব করলে রসূলুল্লাহ স. তা গ্রহণ করে এই মর্মে একটি ফরমান জারী করেন যে, তাদের জান মাল বিষয় সম্পদ, গির্জা প্রভৃতির নিরাপত্তা বহাল থাকবে এবং তারা এর বিনিময়ে মুসলমানদের জিযিয়া দিবে। খলীফা হযরত আবূ বকর রা. পর্যন্ত এ নীতি বহাল থাকলেও হযরত ‘উমর রা. এর সময় এরা ভীষণভাবে সূদ ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। সর্বোপরি এদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এই আশংকার সৃষ্টি হয় যে, এরা কোনদিন হয়ত ইসলামের ক্ষতি সাধন করে বসবে। উমর রা. তাদেরকে নাজরান থেকে নির্বাসিত করেন এবং নিম্নের নির্দেশনামাটি লিখে দেন : ‘সমাচার এই যে, এই সমস্ত লোক সিরিয়া এবং ইরাকের যে সমস্ত বাসিন্দাদের কাছে যাবে তারা যেন এদেরকে কৃষি কাজের জন্য জমি দান করে। আর যে সমস্ত জমি এরা চাষ-বাস করবে সেগুলো এদের ইয়ামনের জমির বিনিময় হিসাবে পরিগণিত হবে। হযরত ‘উমর রা. নাজরানবাসীদেরকে নির্বাসন দেয়ার পূর্বে তাদের ভূসম্পত্তি এবং মাল সম্পত্তি খরিদ করে নেন।’[১৩০]

মোটকথা, ঐ সমস্ত লোক দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ সিরিয়ায় চলে যায়, আবার কেউ কেউ কুফা অঞ্চলে গিয়ে ‘নাজরানিয়া’ বসতি গড়ে তুলে। বসতির এই নাম (নাজরানিয়া) ওরাই দিয়েছিল।[১৩১]

হযরত ‘উসমান রা. খিলাফত লাভ করার পর নাজরান সম্প্রদায়ের এক দল প্রতিনিধি তাঁর কাছে এসে আবেদনপত্র পেশ করে। আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত ‘উসমান রা. কুফার শাসনকর্তা ওয়ালিদ ইব্‌ন ‘উকবার কাছে লেখেন : ‘বাদ সমাচার এই যে, আমার কাছে নাজরানের এক দল প্রতিনিধি-পাদরী আসকাফ এবং আরো কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা.-এর ফরমান নিয়ে আসেন এবং তারা আমাকে সেই পত্রও

www.pathagar.com

দেখান, যা হযরত 'উমর রা. তাদেরকে দিয়েছিলেন। আমি তাদের সম্পর্কে 'উসমান বিন হানিফের সাথে আলোচনা করেছি। তিনি বলেন, 'আমি এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, এই শর্ত ভূ-মালিকদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা এর কারণে তারা তাদের ভূসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তাই আমি এদের জমির বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এদের জিযিয়া থেকে দুই শত হিল্লা (একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ) হ্রাস করে দিচ্ছি এবং এদের দেখাশুনার ভার তোমার উপর অর্পণ করছি। কেননা এরা এমন একটি সম্প্রদায়, যাদের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি।[১৩২]

মক্কার[১৩৩] ভূ-সম্পত্তি

তৎকালীন মক্কা ও তার আশেপাশের জমি ছিল চাষাবাদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এ কারণে মক্কায় কোন চাষ হত না। মহান আল্লাহ্ এ স্থানকে 'ওয়াদী গায়রি যি যারয়িন' [চাষাবাদ অযোগ্য উপত্যকা] নামে অভিহিত করেছেন। বন-জঙ্গল এবং খণিজ সম্পদ না থাকায় সেখানে সব সময় কাঁচামালের অভাব লেগে থাকত। এ কারণে সেখানকার শিল্প-বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়নি। যে দু'একটি শিল্প সেখানে গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে 'দাবাগত' [চামড়া প্রক্রিয়াকরণ] শিল্পই ছিল প্রধান। কেননা সেখানে উট এবং বকরীর চামড়া সহজলভ্য ছিল।[১৩৪]

মদীনার[১৩৫] ভূ-সম্পত্তি

মদীনায় কৃষি কাজের প্রচলন ছিল এবং বহু লোক সেখানে কৃষি কাজে লিপ্ত ছিলেন। মূলত মদীনা ছিল কিষাণদেরই শহর। মদীনায় হিজরতের পর মুহাজিররা আবার ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন এবং আনসাররা তাদের ক্ষেত-কৃষি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন,'আমার মুহাজির ভাইয়েরা হাট-বাজারে বেচা-কেনায় এবং আমার আনসার ভাইয়েরা তাদের চাষাবাদ ও বাগানের কাজে ব্যস্ত থাকতেন।[১৩৬] দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও স্বাভাবিক শ্রমশীলতার কারণে মদীনাবাসীরা কৃষিকর্মে পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা খেজুর গাছে তা'বীর করা [পরাগায়ণ] জানতেন। মদীনার কৃষিক্ষেতগুলোতে বৃষ্টি এবং কুয়ার পানি ছাড়াও নদী থেকে সেচ দেয়া হত। মদীনা এবং তার আশে-পাশে খেজুর বাগান ছাড়াও যব ও গমের ক্ষেত ছিল। মদীনার নিকটবর্তী সোরাকিয়া অঞ্চলে অনেকগুলো কৃষিক্ষেত, খেজুর বাগান এবং বাগ-বাগিচা ছিল, যেগুলোতে আঙ্গুর, আনার প্রভৃতি ফল-ফসল জন্মাত।[১৩৭]

রসূলুল্লাহ স.-এর দশ বছরের মাদানী জীবনে প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে আসে এবং দশ বছর পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ২৭৫ বর্গমাইল এলাকা মুসলমানদের আয়ত্বে আসতে থাকে। যেসব এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত হতো তিনি সেগুলোকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। আর যেসব এলাকা

www.pathagar.com

যুদ্ধ ছাড়াই অধিকৃত হতো তিনি সেগুলোকে সরকারী সম্পত্তি বলে ঘোষণা করতেন, কখনো প্রয়োজনে কিছু অংশ সাহাবাগণের মধ্যেও বন্টন করে দিতেন। কোন অঞ্চলের লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের অঞ্চলকে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে বা কোন ইহুদী-খ্রিষ্টান ও অগ্নি উপাসক জিযিয়া আদায় করতে স্বীকৃত হলে তিনি তাদের ভূসম্পত্তিকে নিজ নিজ দখলে রাখার অনুমতি দিতেন। ঐ সব এলাকার কোন জমি পূর্ব থেকে বেদখল অবস্থায় পড়ে থাকলে তিনি সেগুলোকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।[১৩৮]

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআন, ৬৭:১৫।
২. আল-কুরআন, ২:২৬৭।
৩. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ও অন্যান্য, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, ঢাকা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫, পৃ. ৫৪৮।
৪. ড. এফ. এম মনিরুজ্জামান, *বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭, পৃ.৪৫।
৫. মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, *উদ্ভিদ পরিবেশ বিজ্ঞান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ.৫৪।
৬. আবদুল কাদের আল-কাফী, *আল-কুরআনুল কারীম ওয়া তালাওয়াসুর-রিয়া*, কুয়েত ঃ মাকতাবাতুল-মানার আল-ইসলামিয়্যা, ১৯৮৫, পৃ.৪।
৭. ড. মোঃ সদরুল আমিন, *পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ মৃত্তিকার ভৌত ধর্ম*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ.২০।
৮. ড.মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩, পৃ.৯৬।
৯. ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ.৮৩।
১০. আল-কুরআন, ৫৫:৩৩।
১১. আল-কুরআন, ১১:৬১।
১২. আল-কুরআন, ২:২২।
১৩. আল-কুরআন, ২:৬১।
১৪. আল-কুরআন, ২২:৫।
১৫. আল-কুরআন, ২০:৫৫।
১৬. আল-কুরআন, ৫৫:১০-১২।
১৭. আল-কুরআন, ৩৬:৩৩-৩৬।

www.pathagar.com

১৮. ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

১৯. আল-কুরআন, ১৫:১৯-২০।

২০. আল-কুরআন, ৬৭:১৫।

২১. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* ১ম খ., ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি, পৃ.৩১৪।

২২. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরাহ, *জামে' আত তিরমিযী,* ১ম খ., দিল্লী : মাকতাবাহ রশীদিয়্যাহ, তা.বি., পৃ.২৫৬।

২৩. আল-কুরআন, ৬৭:১৫।

২৪. আল-কুরআন, ২:২৬৭।

২৫. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৯-৪০।

২৬. অধ্যাপক এম,এ,সামাদ, *ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা,* ফরিদপুর : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১, পৃ.৩।

২৭. প্রাগুক্ত,পৃ.৩-৪।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৪।

২৯. মোঃ আবূ তাহের, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং,* ঢাকা : তামান্না পাবলিকেশন্স, ২০০৬, পৃ. ৬৯।

৩০. 'আইয়্যামে জাহিলিয়্যা'–এর অর্থ প্রাক-ইসলামী যুগের আরবদের অবস্থা। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স.-এর হিজরতের পূর্বকাল। কেননা প্রাক ইসলামী যুগে আরব দেশে মুশরিকদের যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল, তা মহান আল্লাহর কোন ইলহামের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। রসূলুল্লাহ স.-এর পূর্ববর্তী দেড়শত বছর সময়কালকে জাহিলী যুগ বলা হয়। এ সময় আরবদের অধিকাংশ বেদুঈন এবং তাদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিল। তারা গোত্রীয় জীবন যাপন করত। দানশীলতা ও বীরত্বের সাথে সাথে তাদের চরিত্রে ছিল হিংসা-দ্বেষ, শত্রুতা এবং পরশ্রীকাতরতা। তাদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যা, লুণ্ঠন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কোন কোন গোত্রে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। অত্যাচার, অবিচার, হত্যার বদলে হত্যা, জুয়া খেলা, মদ্যপান এবং কুসংস্কার জাহিলী সমাজের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ছিল; এমনকি সৎ মাতাকে বিবাহ করার কুপ্রথাও প্রচলিত ছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মুহম্মদ ইসলাম গণী, 'জাহিলিয়্যা' *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১১শ খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ.৫৫৩-৫৫৪)।

৩১. মোঃ আবূ তাহের, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং,* প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯-৭০।

৩২. গাজী শামছুর রহমান, 'ইসলাম-পূর্ব যামানার কৃষক', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃ.৫৭।

www.pathagar.com

৩৩. আবূ জাফর আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আত-তাহাবী, *শারহু মা'আনিল আছার*, ১ম খ., বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪০০/১৯৭৯, পৃ. ৭৮।
৩৪. গাজী শামছুর রহমান, 'ইসলাম-পূর্ব যামানার কৃষক', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭।
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮।
৩৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, ২য় খ., দিল্লী : মাকতাবাহ রশীদিয়্যাহ, তা.বি.,পৃ.১১।
৩৭. মালিক ইব্‌ন আনাস, আল-*মুয়াত্তা*, ২য় খ., কায়রো : দারুল হাদীস, তা.বি., পৃ.৪৮৬।
৩৮. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, ৪র্থ খ., কায়রো : দারুদ্‌দিয়ান লিততুরাছ, তা.বি., পৃ.৪৭২।
৩৯. গাজী শামছুর রহমান, '*ইসলাম-পূর্ব যামানার কৃষক*', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯।
৪০. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আশ-শায়বানী আল-জাযারী আল-মাওসিলী, *জামি'উল উসূল ফি আহাদীছির রাসূল*, বৈরুত : দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছ, ১৪০১/১৯৮০, পৃ.৬৮।
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮-৫৯।
৪২. জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুক্‌রিম ইব্‌ন মানযূর, *লিসানুল 'আরাব*, বৈরুত : দারু সাদির, ১৪১১/১৯৯০, পৃ.৭৫।
৪৩. আবূ মুহাম্মদ আলী ইব্‌ন হাযম, কিতাবুল মুহাল্লা বিল আসার ফী শারহিল মুজাল্লা বিল ইখতিসার, কায়রো, তা.বি, পৃ.৭৮।
৪৪. আল-ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রিস শাফি'ঈ, *কিতাবুল উম্ম*, বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৩৯৩/১৯৭৩, পৃ. ৫৫।
৪৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.১০।
৪৬. সুলায়মান ইব্‌নুল আশআছ আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮৩।
৪৭. প্রাগুক্ত।
৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রিস শাফি'ঈ, *কিতাবুল উম্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬।
৪৯. গাজী শামছুর রহমান, '*ইসলাম-পূর্ব যামানার কৃষক*', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩-৬৪।
৫০. 'কুলসুম ইব্‌নুল হিদম (রা.)'–আনসার গোত্রের শাখা বনূ আউস গোত্রের লোক। রসূলুল্লাহ সা. হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম কুবায় তাঁর গৃহে উঠেন। তিনি ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক। রসূলুল্লাহ সা.-এর মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইন্তিকাল করেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,-মুহাম্মদ মূসা, 'কুলছুম ইবনুল-হিদ্‌ম', *ইসলামী*

www.pathagar.com

বিশ্বকোষ, ৯ম খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, পৃ.১৩৮-৩৯)।

৫১. মুহাম্মদ ইবন সা'দ, *আত্-তাবাকাত,* ৩য় খ., বৈরুত : দারু সাদির, তা.বি, পৃ.৬২৩।

৫২. 'উম্মে আয়মান'–রসূলুল্লাহ স.-এর আযাদকৃত ক্রীতদাসী সাহাবীয়া। জন্ম সন অজ্ঞাত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর শৈশবে আয়া হিসেবে তাঁর দেখাশুনা করতেন। উম্মে আয়মন রা. তাঁর কুনিয়াত। আয়মন নামে তাঁর এক সন্তান ছিল। তাঁর দিকে সম্পর্কিত করে এই ডাকনামে তিনি অভিহিত হন। তাঁর আসল নাম বারাকা। তিনি রসূলুল্লাহ স. হতে বহু হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত 'উসমান রা.-এর খিলাফতের শুরুতে তিনি ইন্তি কাল করেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, 'উম্মু আয়মান', *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ৬ষ্ঠ খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ.৫৭-৫৮)।

৫৩. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* ১ম খ., ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি, পৃ.৩৫৮।

৫৪. 'হারিসা ইব্ন নু'মান'–একজন আনসার সাহাবী, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ, খাজরাজ গোত্রের বনূ নাজ্জার শাখায় জন্ম। তিনি বদর, ওহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি দু'বার হযরত জিব্রাঈল আ.-কে স্বচক্ষে দেখেছেন। রসূলুল্লাহ স. হতে কিছু হাদীসও বর্ণনা করেছেন তিনি। শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। তিনি আমীর মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে ইন্তিকাল করেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আবদুল জলীল, 'হারিছা : ইবনু'ন নু'মান', *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ২৫শ খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ.৪৫১)।

৫৫. 'হযরত ফাতিমা'–বিশ্বের নারী সমাজের নেত্রী, রসূলুল্লাহ স.-এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান ও হুসাইন রা.-এর সম্মানিত মাতা এবং রসূলুল্লাহ স.-এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা রা.-এর কন্যা। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তিনি নবুওয়তের প্রথম বছর জুমাদাল উখরা মাসের ২০ তারিখ জন্ম গ্রহন করেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি এই তারিখ হতে পাঁচ বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। মক্কা নগরীতে তাঁর জন্ম হয়। হিজরতের পর যায়িদ ইব্ন হারিসা রা. ও আবূ রাফি' রা. তাঁকে মদীনায় নিয়ে আসেন। বদরের যুদ্ধের পর হযরত আলী রা.-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। ওহুদ যুদ্ধের পর তাঁকে স্বামী গৃহে তুলে নেয়া হয়। বিবাহের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৫ বছর ৫ মাস। কারো মতে ১৮ বা ১৯ বছর। বিবাহে ৫০০ দিরহাম মহর নির্ধারিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তিকালের ৬ মাস পর তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৮ অথবা ৩০ বছর। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন. আবদুল জলীল, 'ফাতিমা রা.', *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১৪শ খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ.৫৬৫-৫৭২)।

৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, *আত্-তাবাকাত,* ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮৮।

www.pathagar.com

৫৭. 'বনূ নযীর'—মদীনার তিনটি ইহুদী গোত্রের মধ্যে একটি। এরা রোমীয় হুমকির ফলে কোন এক অজ্ঞাত সময়ে ফিলিস্তিন হতে মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রথমে তারা আন-নযীর নামক পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এ কারণেই তাদের বনূ নযীর নাম হয়। এরা প্রথমে গোপনে এবং পরবর্তীতে প্রকাশ্যে মদীনার সনদের শর্ত ভঙ্গ করে রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর অনুসারীগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ গোত্রের তৎকালীন প্রভাবশালী গোত্রপতি ছিল হুয়াই ইব্ন আখতাব, যার কন্যা হযরত সাফিয়্যা রা. এর সাথে ৭ম হিজরীতে রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে বিবাহ হয়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, নুরুদ্দীন আহমদ, 'বনূ নাযীর', *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ২য় খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ.৪৯)।

৫৮. মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমর ইব্ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী,* ১ম খ., বৈরুত : আলিমুল কুতুব, ১৪০৪/১৯৮৪, পৃ.২৬২-৬৩।

৫৯. 'আল-ওয়াকিদী'—পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমর ইব্ন ওয়াকিদ। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান আরব ঐতিহাসিক। তিনি হি. ১৩০ সালে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ আল-ওয়াকিদ আল-আসলামীর নামানুসারে তাঁর সম্বন্ধবাচক নাম আল-ওয়াকিদী। ২০৭ হিজরীর শেষ পর্যায়ে তিনি ইন্তিকাল করেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন, 'আল-ওয়াকিদী' *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ৬ষ্ঠ খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ.২২০-২২২)।

৬০. আবূল হাসান আল-বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, ১ম খ., মিসর : দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি., পৃ.৫২৬। সেখানে উল্লেখিত আছে যে 'উসমান রা. ৪০০ দিনার দিয়ে রুমা কূপটি কিনেছিলেন।

৬১. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম, *আস সীরাতুন নাবাবিয়্যা,* বৈরুত : মাকতাবাতুস-সাফা, দারুল বায়ান আল-হাদীসাহ, ১৩৭৫/১৯৫৫, ৩য় খ., পৃ.৬৮৩।

৬২. 'বনূ কায়নুকা'—বনূ কায়নুকা মদীনার একটি ইহুদী গোত্রের নাম। তারা মদীনার এক প্রান্তে বসবাস করতো। দু'টি সুরক্ষিত দুর্গের অধিকারী ছিল তারা। সেখানে তাদের কৃষিভূমি ও ফলের বাগান কিছুই ছিল না। তারা পেশাগতভাবে ব্যবসায়ী বা স্বর্ণকার ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম রা.-এই গোত্রের লোক ছিলেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম, 'কায়নুকা' *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ৭ম খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ.১৫৪-১৫৬)।

৬৩. আল-কুরআন, ৩:১২-১৩।

৬৪. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উবাই ইব্ন সালুল'—(সালুল 'উবাই-এর মাতার নাম)। ইসলামের ইতিহাসে 'রাঈসুল মুনাফিকীন' (মুনাফিকদের প্রধান)-রূপে প্রসিদ্ধ। ২/৬২৪-এ বনূ কায়নুকার বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক অভিযান প্রেরণ কালে 'আবদুল্লাহ রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট তাদের অনুকূলে সুপারিশ করে। ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কিত পরামর্শ সভায়

www.pathagar.com

আবদুল্লাহর প্রস্তাব ছিল মদীনার অভ্যন্তরে থেকে আক্রমণ প্রতিরোধ করা। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবীর মতানুসারে মদীনার বাইরে যেয়ে শত্রুর মুকাবিলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে আবদুল্লাহ তা সমর্থন করেনি বরং সে তার তিনশত অনুসারীসহ মুসলিম বাহিনী পরিত্যাগ করে চলে আসে। এ ঘটনাটি দ্বারা আবদুল্লাহর কাপুরুষতা ও আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তার আনুগত্যহীনতা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এভাবেই সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে যায়। তাবুক যুদ্ধের কিছু দিন পর ৯/৬৩১ সালে তার মৃত্যু হয়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ফরীদুদ্দীন মাসউদ, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি ইব্‌ন সালুল', *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮-৬৯)।

৬৫. আল-কুরআন, ৫:৫১।

৬৬. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *তারিখুত তাবারী,* কায়রো : দারুল মা'রিফা, তা.বি., পৃ.৯০।

৬৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী,* ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৮।

৬৮. আবূল হাসান আল-বালাযুরী, *আনসাবুল আশরাফ,* ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।

৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, *আস-সিরাত,* পৃ.৩৬৩।

৭০. গাজী শামছুর রহমান, 'রসূলুল্লাহ স. ও খুলাফা-ই- রাশেদীনের যামানার কৃষক', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানু-মার্চ ১৯৮৪, পৃ.৪৩৭।

৭১. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম, *আস সীরাতুন নাবাবিয়্যা,* বৈরুত : মাকতাবাতুস-সাফা, দারুল বায়ান আল-হাদীসাহ, ১৩৭৫/১৯৫৫, ৩য় খ., পৃ.৬৮৩।

৭২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী,* ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৩।

৭৩. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম, *আস সীরাতুন নাবাবিয়্যা,* প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮৩।

৭৪. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *তারীখুত তাবারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৭৫. প্রাগুক্ত।

৭৬. ইব্‌ন হাজার আসকালানী, *ফতহুল বারী,* ৭ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩১।

৭৭. ইব্‌ন ইসহাক, *আস- সীরাত,* ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.১৯১।

৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী,* ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৩।

৭৯. ইব্‌ন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ৭ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩১।

৮০. আল কুরআন, ৫৯ : ৫।

৮১. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম, *আস সীরাতুন নাবাবিয়্যা,* ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮৩।

৮২. প্রাগুক্ত।

৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, আস-সিরাত, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩৭।

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৮।

www.pathagar.com

৮৫. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *তারীখুত তাবারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫২।

৮৬. আল-কুরআন, ৫৯: ৬।

৮৭. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম, *আস সীরাতুন নাবাবিয়্যা*, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮৩-৮৪।

৮৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী*, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮০।

৮৯. নূরুদ্দীন আহমদ, 'বানূ নাযীর' *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ.৪৯।

৯০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী*, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮০; মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ, *আত্‌-তাবাকাতুল কুবরা*, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮।

৯১. মুহাম্মদ ইবন সা'দ, *আত্‌-তাবাকাত*, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.১৩২-১৩৩।

৯২. 'বনূ কুরায়জা'–বনূ কুরায়যা মদীনার তিনটি ইহুদী গোত্রের অন্যতম। তারা বনূ নযীর গোত্রের আত্মীয় ছিল। উভয় গোত্রকে এক সাথে বানূ দারিয়্যা বলা হত। বনূ কুরায়জার দু'টি শাখা ছিল–বনূ কা'ব এবং বনূ 'আমর। তারা শহরের বাইরে দক্ষিণ দিকে মাহযুর প্রান্তর সংলগ্ন এলাকায় নিজেদের আত্মীয় হাদাল গোত্রের সাথে বসবাস করত। তারা কৃষিযোগ্য ভূমির মালিক ছিল এবং তাদের পেশা ছিল কৃষিকার্য। তারা কৃষির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। রসূলুল্লাহ স.-এর মদীনা আগমনের সময় তাদের মধ্যে ৭৫০ জন যোদ্ধা ছিল এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রের একটি বিরাট ভান্ডারও ছিল। অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় এরাও ইসলামের প্রতি প্রথম হতেই শত্রুভাবাপন্ন ছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সিরাজ উদ্দীন আহমদ, 'কুরায়জা', *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৯ম খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, পৃ.৫২-৫৩)।

৯৩. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম, *আস সীরাতুন নাবাবিয়্যা*, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৭১৫।

৯৪. ইব্‌ন হাজর আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, ৭ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৮-৯।

৯৫. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম, *আস সীরাতুন নাবাবিয়্যা*, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৭১৬।

৯৬. আবূ আব্দুল্লাহ আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল মুসনাদ*, ৩য় খ., রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ্‌-দুয়ালিয়া, পৃ.৩৫০।

৯৭. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮।

৯৮. আবূ আব্দুল্লাহ আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল মুসনাদ*, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫০।

৯৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী*, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৯।

১০০. ইয়াহইয়া ইব্‌ন আদম, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০।

১০১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী*, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৫২১-২২।

www.pathagar.com

১০২. 'খায়বার'–শব্দের অর্থ দুর্গ। এর নামকরণ করা হয়েছে খায়বার-এর প্রতিষ্ঠাতা খায়বার ইব্‌ন কানিয়ার নামানুসারে। রসূলুল্লাহ স. যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন সেখানে শুধু ইহুদীরাই বসবাস করত। তারা ছিল বিত্তশালী। খায়বরের বৃহত্তম দুর্গের নাম আল কামুস, যা হযরত আলী রা. জয় করেছিলেন। রসূলুল্লাহ স. খায়বারের যুদ্ধে যে স্থানে অবস্থান করেছিলেন, সেখানে অবস্থিত বড় মসজিদটি-ই মসজিদে নববী হিসেবে পরিচিত। ৭/৬২৮ সনে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সংঘটিত যুদ্ধের দরুন ইসলামের ইতিহাসে খায়বার প্রসিদ্ধি লাভ করে। মদীনা হতে বহিষ্কৃত বনূ নযীর গোত্রের ইহুদীগণ এ স্থানে এসে বসতি স্থাপন করে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মু. মাজহারুল হক, 'খায়বার' *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ৯ম খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, পৃ.৫৭৮-৮১)।

১০৩. আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম, *আস সীরাতুন নাবাবিয়্যা,* ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫।

১০৪. প্রাগুক্ত, ৩য় খ., পৃ.২৭২।

১০৫. প্রাগুক্ত।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩।

১০৭. প্রাগুক্ত, ২য় খ., পৃ.১৯৫।

১০৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী,* ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ.৬৩৪।

১০৯. ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, ফতহুল বারী, ৭ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৪,

১১০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী,* ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩৯।

১১১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী,* ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯০।

১১২. আবুল হাসান আল বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান,*প্রাগুক্ত, পৃ.২৩।

১১৩. আবূ উবাইদ কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম, কিতাবুল আমওয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬।

১১৪. প্রাগুক্ত।

১১৫. প্রাগুক্ত।

১১৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী,* ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ.৬৯৬।

১১৭. প্রাগুক্ত।

১১৮. 'ওয়াদিউল কুরা'–দক্ষিণ আরব হতে সিরিয়ার দিকে প্রাচীন বাণিজ্য পথের উপর আল-'উলা এবং আল-মদীনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। একে সাধারণভাবে বলা হয় ওয়াদী দেইদিব্বান। ওয়াদিউল কুরার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল উন্নত খর্জুর বিথী ও শস্যক্ষেত্রসহ আল-উলা, যা তার অস্তিত্বের জন্য উপত্যকার উক্ত প্রস্রবনের কাছে ঋণী। এক সময় কুরহ ছিল ওয়াদিউল কুরার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র। ইসলামের প্রারম্ভে ওয়াদিউল কুরাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক য়াহূদীর বসতি ছিল। তারা ইসলামের শত্রু ছিল। দ্বিতীয় হিজরীতে (৬২৩-৬২৪ খ্রি.) বিতাড়িত বানূ

www.pathagar.com

কায়নুকাকে তারা এক মাসের জন্য আশ্রয় দিয়েছিল, তাদেরকে খাদ্য দিয়েছিল এবং আরোহনের জন্য যানবাহন হিসেবে অনেক ঘোড়া দিয়েছিল। তারা সর্বদাই মুসলমানদের ক্ষতিতে লিপ্ত ছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, এ.বি.এম. আবদুল মান্নান মিয়া, 'ওয়াদিল-কুরা' *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ. ২৩৫)।

১১৯. আবুল হাসান আল-বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১২০. মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমর ইব্ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী*, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৭১১

১২১. আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব আল-বাসরী আল-বাগদাদী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬২।

১২২. 'তায়মা'–উত্তর আরবে পানির প্রাচুর্যে ভরা এক মরুদ্যানের মধ্যে অবস্থিত একটি প্রাচীন জনবসতির নাম। জনবসতিটি অপেক্ষাকৃত এক নিম্নভূমিতে অবস্থিত। উত্তর আরবের অন্যান্য মরুদ্যানের মতো এই স্থানেও বহিরাগত য়াহূদীগণ বসতি স্থাপন করেছিল। তায়মার অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় এর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। ফলে বার্ষিক একটি কর প্রদানের বিনিময়ে তারা ভূমির অধিকার ও সেখানে থাকার অনুমতি পেয়েছিল। পরবর্তীতে তাদের অবাধ্যতার কারণে হযরত 'উমর রা. তাদেরকে বহিষ্কার করেছিলেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মোঃ মনিরুল ইসলাম, 'তায়মা' *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১২শ খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ২৭৮-৭৯)।

১২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমর ইব্ন ওয়াকিদ, *কিতাবুল মাগাজী*, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.৭১১।

১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৭১২।

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৭১২।

১২৬. আবুল হাসান আল-বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২।

১২৭. 'তা'ইফ'-মক্কা শরীফের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত আরবের একটি শহর। ইসলাম পূর্ব যুগ হতেই তা'ইফ ও মক্কার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। তাইফে উৎপাদিত ফসলাদি মক্কায় বিক্রয় হতো। কুরআনুল কারীমে তা'ইফ ও মক্কাকে একত্রে 'কারয়াতাইন' বলা হয়েছে। বর্তমানে স্থানটি সৌদী আরবের গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল হিসাবে খ্যাত। (বিস্ত ারিত জানার জন্য দেখুন, মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, 'তা'ইফ' *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১২শ খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ৬৭-৬৯)।

১২৮. আলী ইব্ন মুহাম্মদ আবুল হাসান ইবনুল আসীর, আল কামিল ফিত-তারিখ, দারুসাদির, বৈরুত : ১৯৬৫, ১ম খ., পৃ.২৫৩

১২৯. 'নাজরান'–উত্তর ইয়ামানের একটি উপত্যকা, মরুনদী, জিলা ও শহর। সান'আ হতে এর দূরত্ব সাত দিনের পথ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলিম লেখকদের বর্ণনা মতে, নাজরান উর্বরতা ও সম্পদের দিক হতে কার্যত এক বিস্ময়। এখানকার শস্য দানা, সব্জি, ফল ইত্যাদি অতুলনীয়। নাজরানে বিভিন্ন পদার্থের খনিও ছিল। এ ছাড়া

www.pathagar.com

ইয়ামানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চর্ম ও বস্ত্র এখানে উৎপাদিত হয়ে থাকে। এমনকি আজও নাজরান গোটা আরবের মধ্যে সমৃদ্ধির জন্য কিংবদন্তী হয়ে আছে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আফতাব হোসেন, 'নাজরান' *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৩শ খ., ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ৬৫৯-৬৬১)।

১৩০. আবুল হাসান আল-বালাযুরী, ফুতুহুল বুলদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১৩১. প্রাগুক্ত।

১৩২. আবূ উবাইদ কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম, কিতাবুল আমওয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯।

১৩৩. 'মক্কা' আরব উপদ্বীপের অন্তর্গত হিজায প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর এবং মুসলিম জাহানের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। আল-মসজিদুল হারাম এখানে অবস্থিত এবং কা'বা শরীফ মসজিদুল হারামের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। রসূলুল্লাহ স.-এর জন্মস্থানও মক্কা। ইসলাম প্রচার শুরু হয় এখান থেকেই। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, শায়খ নাযীর হুসাইন/মহাম্মদ মাযহারুল হক, 'মক্কাতুল-মুকাররম', *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৬শ খ. (২য় ভাগ), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ. ৮৮-১০৫)।

১৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *তারীখুত তাবারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০২।

১৩৫. আরব উপদ্বীপের হিজায প্রদেশের পবিত্র শহর। এর প্রথম নাম ছিল য়াছরিব। বনূ কায়নুকা, বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যা নামক তিনটি ইহুদী গোত্র এখানে বাস করতো। মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করে আসার পর ইসলাম শৌর্য-বীর্য লাভ করেছে, জিহাদের নির্দেশ পেয়েছে, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধি-বিধান নাযিল হয় এবং দীন উন্নতি ও অগ্রগতির সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌছে যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, নাযীর হুসাইন/আঃ মতিন মাসউদী, 'মদীনা মুনাওয়ারা' *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৬শ খ. (২য় ভাগ), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ. ৮৮-১০৫)।

১৩৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.

১৩৭. গাজী শামছুর রহমান, 'ইসলাম পূর্ব যামানার কৃষক,' প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬

১৩৮. গাজী শামছুর রহমান, রসূলুল্লাহ স. ও খুলাফা-ই-রাশেদীনের যামানার কৃষক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৪, পৃ.৪৩৯।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৮, পৃষ্ঠা ঃ ৬৩-৭৬

ইসলামী ফিকহের আলোকে কালক্ষেপণ

মোহাঃ মঞ্জুরুল ইসলাম

সামাজিক জীবনে অধিকার বাস্তবায়ন হচ্ছে কল্যাণের প্রতীক। সমাজ নিয়েই মানুষের বসবাস। সামাজিক উন্নয়নে পরস্পর সদ্ভাব সম্প্রীতি সৌহার্দ অঙ্গীকার পালন, বিশ্বস্ততার সাথে কর্মসম্পাদন করতে হবে। দায়িত্ব পালনে বিলম্ব কিংবা কালক্ষেপণ থেকে বিরত থাকাই সামাজিক জীবনের উপজীব্য বিষয়। ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানপিপাসুদের অজানা নয় যে, মানুষের অধিকার সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত, তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলার হুকুকও সন্তোষ সাধনে প্রতিষ্ঠিত। আল কুরআন ও আল হাদীসও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিশ্চিত করেছে। সামাজিক জীবনে মানুষের অধিকার বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ কিংবা বিলম্বকরণ অনিষ্টকর বিষয়। দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কালক্ষেপণের দ্বারা সমাজে ছল চাতুরি, প্রতারণা, কপটতা, প্রবঞ্চনা ঠকবাজী, ধোঁকা, গুরুতর মিথ্যা ও অসত্য বিস্তার লাভ করে। ক্ষতিকারক বিষয় থেকে পরিত্রাণ প্রসঙ্গে কোন সাহাবী জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, ان الرجل إذا غرم حدّث فكذب، ووعد فأخلف 'মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে।'[১]

তাই সামাজিক জীবনে উন্নয়নের লক্ষে ইসলামী শরীয়তের আলোকে প্রাপ্য ও অধিকার আদায়ে কালক্ষেপণের স্বরূপ বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। নিম্নোক্ত কারণগুলো সামনে রেখে এ বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস পাব;

ক. ব্যাপারটি এখন অনেকটাই ব্যাপকতা পেয়েছে। গণমানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য অনেক ব্যক্তি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদবিহীন ঋণ প্রদান করে।

খ. কিন্তু দেখা যায়, যৌক্তিক কারণ ছাড়াই অনেক ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার মূলধন পেতে বিলম্ব হয়, অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ চেক হস্তান্তরে কালক্ষেপণ করে।

গ. কেউ কেউ স্বীয় অধিকার নিশ্চিত করতে যেয়ে অন্যের অধিকারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। অন্যায় ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

লেখক ঃ প্রাবন্ধিক, পিএইচডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট হুকুম বর্ণনার জন্য 'ইসলামী ফিকহের আলোকে 'কালক্ষেপণ' শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করছি। এই প্রবন্ধে কালক্ষেপণের সংগা, হুকুক সম্পর্কীয় আলোচনা, ঋণের কারণ সমূহ, হকের গুরুত্ব, হকের শ্রেণীবিন্যাস, কালক্ষেপণের ক্ষতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া কালক্ষেপণের প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে।

আল-মুমাতলাহ المماطلة। (কালক্ষেপণ) এর সংগা

আরবীতে المماطلة। শব্দটি م-ط-ل ধাতু থেকে নেয়া হয়েছে। ভাষাবিদ আল আযহারী বলেন ঃ

هو إطالة المدافعة وكل مضروب طولا من حديد وغيره فهو ممطول-

'প্রতিরোধ দীর্ঘায়িত করা অথবা কোন লোহা জাতীয় জিনিসকে পিটিয়ে দীর্ঘায়িত করা ইত্যাদি।'[২]

المماطلة। শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Procrastination (কালক্ষেপণ, দীর্ঘসূত্রিতা, Temporization গড়িমসি, delay বিলম্ব, দেরী করা ইত্যাদি।'[৩]

ইবনে ফারিস বলেন,

والمطل اصل يدل على مدّ الشئ واطلته ومنه يقال : مطله بدينه مطلاً إذا سوفه بوعد الوفاء مرةبعد أخرى-

বিলম্বকরণ-এর মূল হচ্ছে কোন জিনিসকে টেনে লম্বা করা।"[৪] এ অর্থেই কেউ যখন ঋণ পরিশোধে অহেতুক বিলম্ব বা কালপেক্ষণ করে তখন বলা হয়।

'সে বারংবার অঙ্গীকার করেও পূর্ণ করতে গড়িমসি করছে'।[৫]

পারিভাষিক অর্থে আল্লামা নববী ও মোল্লা আলী কারী বলেন ঃ

منع قضاء ما استحق أداؤه - وزاد القرطبى قيدا فقال عدم قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن منه - وقال الحا فظ ابن حجر ويد خل فى المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم لرعيته وبالعكس-

কারো প্রাপ্য আদায় থেকে বিরত থাকাই মু'মাতিলা কালপেক্ষণ বা গড়িমসি। কুরতবী বলেন, সামর্থ থাকার পরও কারো প্রাপ্য আদায় না করাই মুমাতিলা। ইবনে হাজার র. বলেন, অপরিহার্য আদায়যোগ্য যে কোন ব্যাপারে গড়িমসি করাই মুমাতিলা, যেমন স্বামীর জন্যে স্ত্রীর হক আদায়, শাসকের জন্যে প্রজাদের হক আদায় ইত্যাদি।[৬]

www.pathagar.com

উক্ত সংগার আলোকে কেউ বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্ব করলে তার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ে তিনি কালক্ষেপণকারী হিসেবে গণ্য হবেন না। কেননা ঋণদাতা তার ঋণ নির্দিষ্ট বিলম্বে পরিশোধে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। তাই ঋণদাতার ত্বরান্বিত করণের ক্ষমতা খর্ব হবে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ঋণগ্রহীতার উপর চাপ প্রয়োগ অবৈধ হবে। আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা কিংবা যৌক্তিক কোন অসুবিধার কারণে ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ও কালক্ষেপণকারী হিসেবে গণ্য হবে না। অসুবিধাগুলো হচ্ছে ঃ আর্থিক অপারগতা, তারল্য বস্তুতে ঘাটতি হওয়া ইত্যাদি। অনেক সময় বাজারের মন্দাভাবের কারণে পণ্য বিক্রি সম্ভব হয়ে উঠে না, আর সে সময় ঋণগ্রহীতার এমন কোন সম্পদ থাকে না যা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়, তাই ঋণদাতা ধৈর্যাধারণ করবে অথবা এসব জিনিসের বিনিময় গ্রহণ করবে।

حقوق (হুকুক) এর পরিচিতি

আরবীতে حق শব্দটি باطل এর বিপরীত শব্দ। ভাষাবিদ ইব্‌ন মানযুর বলেন, হক এর অর্থ হলো ঃ কোন বিষয়ের মূল উৎস যথাযথভাবে দৃঢ় ও স্থায়ী হওয়া।[৭]

وهو مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب ويطلق على العدل والإسلام والمال والملك والموجود الثابت والصدق ويقال حق الله الأمر إذا أثبته وأوجبه–

আল কামূসুল মুহীত গ্রন্থকার বলেন حق (হক) শব্দটি العدل। (আল-আদল) ইনসাফ বা ন্যায় বিচার الاسلام। (আল ইসলাম) আত্মসমর্পণ, المال। (আল-মাল) সম্পদ الملك। (আল-মিলক) মালিকানা, স্বত্ব ও الصدق। (আস সিদক) সত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৯]

حق শব্দের শাব্দিক অর্থে আল্লামা জুরজানী র. বলেন,

هوالثابت الذى لايسوغ إنكاره والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى–

হক এমন দৃঢ় ও স্থির বিষয় যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই الحق। শব্দটি আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম।[১০]

أمافى الاصطلاح، فقد عرفه،عبدالعزيز البخارى صاحب كشف الأسرار بأنه : الموجود من كل وجه الذى لا ريب فى وجوده–

পারিভাষিক অর্থে আব্দুল আযীয আল বুখারী বলেন, 'হক এমন অস্তিত্বশীল বস্তু যা

www.pathagar.com

সকল দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যমানের ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ রাখে না।'[১১]

আল্লামা সানহুরী বলেন,

مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون-

'হক এমন কল্যাণ যার মূল্য আছে এবং হক এমন সম্পদ যার নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত আইন রয়েছে।'[১২]

ঋণ গ্রহণের কতিপয় কারণ

ধনাঢ্য হওয়ার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ে মিতাচারী হওয়া। মিতব্যয় জীবন পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অপচয় ও অমিতব্যয় সর্বদা অভাব অনটনকে আলিঙ্গন করে। যার ফলশ্রুতিতে একদিন ঋণের বোঝা বহন করতে হয়। ঋণগ্রহীতা মিথ্যা চর্চা, অমূলক ও ভিত্তিহীন অজুহাত উপস্থাপন এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ স. ঋণগ্রহীতার স্বভাব প্রসঙ্গে বলেন ঃ

إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف-

'মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয় তখন মিথ্যা কথা বলে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।'[১৩] ঋণের বোঝা বহন করে অধিকাংশ মানুষের নৈতিক পদস্খলন ঘটে। ঋণের ভয়াবহ অবস্থা বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত কারণগুলো আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় ঃ

এক. **প্রবৃত্তির বিস্তৃতি ঃ** বিলাসিতা ও সৌখিনতাপূর্ণ জীবন যাপন, মিথ্যা রটনায় আসক্তি, অন্যায় ও অসৎ কাজে পৃষ্টপোষকতা দান, বাস্তবতার পরিপন্থী নিজেকে প্রকাশ করার প্রবণতা জেগে ওঠে।

দুই. **অপরিণাম দর্শিতা ঃ** ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রতি মনোযোগী না হয়ে যথেচ্ছা জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া, অধিক আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠার যাবতীয় সর াম ও উপকরণ যোগান দানের জন্য ঋণগ্রহণে অভ্যস্ত হওয়া।

তিন. **অতি লোভের প্রবণতা ঃ** বিত্তবান হওয়ার লোভে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ও সার্বিক সম্ভাব্যতা যাবাই না করে মোটা কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোটা অংশের ঋণ করে পুঁজি বিনিয়োগ করার পর লোকসানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

চার. **হত্যা/অঙ্গহানির কারণে ঋণগ্রস্ত হওয়া ঃ** কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করার ফলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ হত্যাকারীকে আর্থিক দণ্ডের সম্মুখীন করে, অথবা মানবদেহের কোন অঙ্গহানির কারণে আর্থিক জরিমানা ধার্য করা হয়। এছাড়া অন্যের সম্পদ বিনষ্ট ও আমানতের খিয়ানতের কারণে ব্যক্তি অনেক শাস্তিযোগ্য অপরাধে দন্ডিত হয়। প্রথমে তাকে খর্বকৃত স্ব স্ব

www.pathagar.com

হক আদায়ে নির্দেশ করা হয়। এ নির্দেশ পালনে উক্ত ব্যক্তির ঋণের বোঝা বহন করা ব্যতীত আর কোন গতান্তর থাকে না।[১৪]

পাঁচ. **ঋণদাতা সংস্থা কার্যবঞ্চিত হওয়া ঃ** বীমাকৃত দ্রব্যসামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে ঋণ গৃহীতা সংশ্লিষ্ট ঋণদাতা সংস্থার শরণাপন্ন হওয়াই স্বতসিদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত। এ ক্ষেত্রে ঋণদাতা সংস্থাই যদি আগুনে ভস্মিভূত হয়। সেক্ষেত্রে বীমাকারীর ক্ষতিপূরণ দিতে ঋণের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

ছয়, **স্ত্রীর ব্যয়ভার বহনে ঋণগ্রস্ত হওয়া ঃ** কোন দরিদ্র স্বামী স্বীয় স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হলে তাকে উপার্জন করে ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য করা হয়, অন্যথায় তাকে ঋণের দারস্থ হতে হয়। কারো স্বামী নিরুদ্দেশ থাকলে হানাফী মতে স্ত্রীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বামীর নামে ঋণ গ্রহণের অবকাশ আছে।

বান্দার হক আদায়ের গুরুত্ব

মানুষের হক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্য পূর্ণ। মালিকের অনুমতি ব্যতীত কারো সম্পদ গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس-

'কোন মুসলমানের সন্তুষ্টি ছাড়া তার কোন সম্পদে হস্তক্ষেপ বৈধ নয়।'[১৫] ইসলাম মানুষের অধিকার খর্ব করাকে নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিলে কিংবা দখলে রাখলে তা ফেরৎ না দেওয়া পর্যন্ত দায়মুক্ত হওয়ার অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. বলেন,

من كانت عنده مظلمة لأخيه، فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه-

'কোন ব্যক্তি আপন ভাইয়ের উপর জুলুম করে থাকলে সে যেন তার কাছ থেকে তা পূর্বেই মাফ করিয়ে নেয়। কেননা, আখেরাতে দিনার দিরহাম দিয়ে এ পাওনা পরিশোধ করা যাবে না। জুলুমের পরিবর্তে তার সওয়াব কেটে নেয়া হবে, সওয়াব না থাকলে মজলুমের গোনাহ জালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।'[১৬]

উল্লেখিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্যের খর্বকৃত সম্পদ, সম্মান ইত্যাদি ইহজগত থেকেই নিষ্পত্তি করতে হবে; নতুবা পরকালীন জীবনে কঠিন দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে কঠোর শাস্তির উল্লেখ রয়েছে ঃ

www.pathagar.com

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ، وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِي تُئْوِيْهِ-وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ-

'সেদিন গুনাহ্গার ব্যক্তি পণ্য স্বরূপ তার সন্তান-সন্ততিকে দিতে চাইবে, আর স্ত্রীকে ও ভ্রাতাকে আর জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সব কিছুকে যাতে এসব তাকে রক্ষা করে।'[১৭]

অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত করে ফেরত না দেয়ার মানসিকতা নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা কিংবা ঋণ নিয়ে ফেরৎ না দেয়ার পাঁয়তারা করা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلا فها أتلفه الله-

'কেউ যদি ফেরৎ দেয়ার ইচ্ছায় কারও সম্পদ গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ফেরত দেয়ার যোগ্যতা দান করেন। আর কেউ যদি অন্যের সম্পদ বিনাশকরণের কুমতলব করে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তার পথ খোলা রাখেন।'[১৮]

উক্ত যেকোন পরিস্থিতিতে অন্যের সম্পদ গ্রহণ করে কালক্ষেপণ কিংবা ফেরৎ না দেয়ার মনস্থ করাই হচ্ছে অন্যের হক বিনষ্ট করা। যে ব্যক্তি ঋণদাতার হক নষ্ট করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। কারণ ঋণপরিশোধ ব্যতীত সকল গুনাই আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। মুহাম্মাদ ইব্ন জাহাশ রা. এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার এক পর্যায়ে রসূলুল্লাহ্ স. ইরশাদ করেন,

والذى نفسى بيده لو أن رجلا قتل فى سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه-

'যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যদি কোন ব্যক্তি আল্লার পথে নিহত হয় পুনরায় জীবন লাভ করে আবার নিহত হয় আবার জীবন লাভ করে এবং সে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় নিহত হয় তবে ঋণপরিশোধ না করা পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[১৯]

কবীরা গুনাহর পরে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ স. থেকে হযরত আবু মূসা আল-আশআরী রা. বর্ণনা করেন ঃ

إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التى نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء-

'কবীরা গুনাহের পর আল্লাহ্ তা আল্লার নিকট সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে ঋণগ্রস্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া।'[২০]

www.pathagar.com

হক এর শ্রেণীবিন্যাস

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হক কয়েক প্রকার। হকের দাবীদার, হকের অধিকারী, যার উপর হক দাবি করা হয় এবং হক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।[২১] এ বিষয়টি আরো বোধগাম্য করে তোলার জন্য নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

এক. হক্কুল্লাহ ঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হক। এতে পৃথিবীর সকল জাতির উপকার জড়িত। শুধুমাত্র সম্মানার্থে আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়। কারণ সকল উপকরণ উপকার বা অপকার থেকে আল্লাহ তা'আলা পূতঃপবিত্র। হক্কুল্লাহ ঃ আল্লাহ্র হক আট ভাগে বিভক্ত।[২২] যথা ঃ

১. বিশুদ্ধ ইবাদত। যেমন সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ। এগুলো হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের এ বিষয়গুলো পালন করা অবশ্য কর্তব্য। ব্যক্তি, পরিবেশ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা শৃঙ্খলা এগুলোর উপর নির্ভর করে।

২. এমন ইবাদত যা অর্থ ব্যয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন সাদকাহ, ফকীর মিসকীনদের দান খয়রাত। রোযার শুদ্ধতার জন্য সাদকাহ ইত্যাদি।

৩. আর্থিক ব্যয় যার সাথে ইবাদত সংশ্লিষ্ট। যেমন 'উশর, মুলমানদের ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ বা শর্তসাপেক্ষে তার অর্ধেক পরিমাণ সরকারি কোষাগারে জমা করতে হয়। এই দানের দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত নিআমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

৪. এমন আর্থিক ব্যয় যার সাথে শাস্তি জড়িত। যেমন ঃ খিরাজ। মুসলিম অধ্যুষিত দেশে মুসলিম ব্যক্তিদের উপর খিরাজ-এর বিধান কার্যকরী হয়ে থাকে। অনাদায়ে শাস্তির বিধান কার্যকরী করা হয়।

৫. গুরু অর্থদণ্ড। যেমন ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদির শাস্তি স্বরূপ প্রদেয় অর্থ। এসব অন্যায় কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে আর্থিক দৈহিক ও কারাবন্দি সব ধরনের শাস্তি দেয়া হয় যাতে সমাজকে বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করা যায়।

৬. লঘু অর্থদণ্ড। যেমন হত্যাকারীকে হত্যার দণ্ড থেকে রেহাই দিয়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে দণ্ডিত করা। কারণ হত্যার পরিবর্তে হত্যা কিংবা আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করার মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির ন্যূনতম উপকার সাধিত হয় না তাই একে লঘু দণ্ড আখ্যা দেয়া হয়েছে।

৭. এমন দণ্ড যাতে রয়েছে ইবাদত। যেমন কাফফারা। অর্থাৎ কসম ভঙ্গের কাফফারা। উযর ব্যতীত রমযানের রোযা ভঙ্গের কাফফারা। যিহার এর কাফফারা। (মায়ের বিশেষ কোন অঙ্গের সাথে স্ত্রীর উপমা)।

৮. এমন হক যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত। যেমন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দেয়া ভূমির নিচে প্রাপ্ত গুপ্ত ধনের যাকাত প্রদান ইত্যাদি।

www.pathagar.com

দুই. বান্দার হক ঃ এতে গণমানুষের স্বার্থ জড়িত থাকে।[২৩] এতে কোন কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তিই লাভবান হয়। যেমন দিয়াত তথা হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ, ঋণের প্রাপ্য অংশ, হরণকৃত বস্তুর পুনরুদ্ধার ও হরণকৃত বস্তু নষ্ট হলে সমমূল্যের ক্ষতিপূরণ, গচ্ছিত সম্পদ ফেরত প্রদান ইত্যাদি। এসব বস্তু আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অনুমোদিত বান্দার হক। বান্দার হক পালন মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালন করার নামান্তর।[২৪]

তিন. হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ

আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের হক যাতে জড়িত তবে আল্লাহ্ তা আলার হক এতে প্রাধান্য রয়েছে। যেমন অপবাদের শাস্তি, বদনাম রটনাকারীর উপর শাস্তিস্বরূপ জরিমানা প্রয়োগ। মানুষের মান সম্মান রক্ষা করা ও পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি থেকে বিরত রাখাই মানব কল্যাণ।[২৫] আর মানব কল্যাণ ও শান্তি আল্লাহ্ তাআলার হক। মানুষের বদনাম ও অপবাদ থেকে বিরত রাখা বান্দার হক রক্ষার অংশ। বদনাম রচনাকারীর মুখোশ উন্মোচন ও মিথ্যা প্রমাণিত করার মধ্যে বান্দার সম্মান ও মর্যাদার হক লুকায়িত রয়েছে।

চার. আল্লাহ্ তা আলার ও বান্দার হক জড়িত তবে বান্দার হক এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য রয়েছে। যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করার কারণে কিসাসের শাস্তি সাব্যস্ত হয়, আর কিসাস প্রয়োগের মধ্যে মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা বিদ্যামান। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে ইরশাদ করেন ঃ

ولكم فى القصاص حيوة ياولى الألباب لعلكم تتقون–

'হে বিবেকবান লোকেরা! এ কিসাসের মাঝেই (সত্যিকার অর্থে) তোমাদের (সমাজ ও জাতির) জীবন নিহত রয়েছে, আশা করা যায় (অতঃপর) তোমরা সতর্ক হয়ে চলবে।'[২৬]

সবার জন্য কল্যাণ কামনা করা আল্লাহ্ তা'আলার হক। আর কিসাসের মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনদের কষ্ট লাঘব হয়। এ ছাড়া হত্যাকারীর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন কিসাসের মাধ্যমে নির্বাপিত হয়। এ ধরনের কল্যাণ শুধুমাত্র বান্দার সাথেই সম্পৃক্ত। ফকীহদের দৃষ্টিতে নিহত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের তিনটি অধিকার থাকে। হত্যাকারীকে হত্যার পরিবর্তে হত্যা কিংবা রক্তমূল্য গ্রহণ বা ক্ষমা করে দেয়া। এতে বান্দার হক প্রাধান্য পায়।[২৭]

কালক্ষেপণের স্বরূপ

ঋণ বা প্রাপ্য আদায়ে গড়িমসি বা কালক্ষেপণ বা বিলম্ব করার বিষয়টি দুভাবে লক্ষ্য করার যায়। অন্যের হক একেবারেই অস্বীকার করা কিংবা অন্যের হক আদায়ে গড়িমসি বা বিলম্ব করা।

www.pathagar.com

এক. অন্যের হক আদায়ে অস্বীকৃতি[২৮]

অন্যের হক আদায়ে অস্বীকৃতির ব্যাপারটি তখনই পরিলক্ষিত হয় যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হক এর দাবীদার ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ না থাকে। তখন অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মালিকের অসচেতনতার কারণে হক অস্বীকারকারী ব্যক্তি এ ধরনের দুঃসাহসিক কার্য সম্পাদনে সচেষ্ট হয়। ঋণগ্রহীতা যখন ঋণ ফেরৎ প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তখন প্রমাণ না থাকার কারণে ঋণদাতার পক্ষে প্রাপ্য অধিকার প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ঋণগ্রহীতার এ সকল কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে জঘন্যতম অপরাধ। এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে দ্ব্যর্থকণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

وَلاَ تَأْكُلُو اأَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبطِلِ وَتُدْلُوْابِهَا إِلَى الْحُكَّامِ.

'তোমরা একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায় অবৈধভাবে আত্মসাত করো না এবং এর একাংশ বিচারকদের সামনে ঘুষ (কিংবা উপঢৌকন) হিসেবে পেশ করো না।'[২৯]

দুই. অন্যের হক আদায়ে বিলম্বকরণ বা কালক্ষেপণ

অনেক ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার হক প্রদানে যদিও অস্বীকার করে না তবে সঠিক সময়ে আদায়ে গড়িমসি করে। বিশ্ব বাজারে অর্থনৈতিক মন্দাভাবের কারণে কিংবা অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য স্টক করা অথবা অর্থের ঘাটতির কারণে ঋণের কিস্তি পরিশোধে বিলম্ব করে। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ আব্দালী আল মালিকী (ইবনুল হাজ নামে পরিচিত) বলেন, যে সমুদয় সম্পদ একেবারেই আদায়ে সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও গড়িমসি করবে নিঃসন্দেহে সে জালিম হিসেবে পরিগণিত হবে।[৩০] এ সম্পর্কে তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর বাণীকে দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ – مطل الغنى ظلم

'ঋণ পরিশোধে ধনাঢ্য ব্যক্তির গড়িমসি (অনাচার) অন্যায়।'[৩১]

কালক্ষেপণের ক্ষয়ক্ষতি

বিভিন্ন কোম্পানি কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ নিয়ে যারা কিস্তি যথা সময়ে প্রদান না করে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। এ সকল সমস্যাকে দুভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন ঃ

প্রথমত বস্তুগত ক্ষতি

এমন ঋণ যা চুক্তি মোতাবেক নির্দিষ্ট তালিকানুযায়ী পরিশোধ করতে সচেষ্ট নয়। এ ধরনের অবস্থা মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে। যা ব্যক্তি, সমাজ এমনকি গোটা দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। অনেক সময় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এ ক্ষতির ধকল সইতে হয়। এ ধরনের ব্যক্তিগত ক্ষতি নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

১. ঋণগ্রহীতা অলাভজনক খাতে বিনিয়োগ করলে ঋণদাতাকে সঠিক সময়ে ফেরৎ দিতে অক্ষম হয়। এর ফলে অনেক প্রকল্প ব্যর্থ হয়ে যায়।
২. ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ের মুনাফা কমে যাওয়ার কারণে বড় ধরনের ব্যয় কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয় না। ব্যবসার ব্যাপকতা ও সম্প্রসারণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। এ ধরনের কোম্পানি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে শেয়ার হোল্ডারদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।
৩. ঋণগ্রহীতা প্রাপ্য টাকা সময়মত পরিশোধ না করার ফলে ঋণদাতার তার অন্যান্য প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।
৪. এমন অনেক কোম্পানি থাকে যেগুলো চুক্তিভিত্তিক পরিচালিত হয়। কোম্পানির প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি বিলম্বে সরবরাহের কারণে উৎপাদন বিলম্বিত হয়। ফলে সেখানে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন পেতেও দেরি হয়। আবার অনেক সময় কর্মহীনও হয়ে পড়ে। ফলে অন্য কোম্পানির দ্বারস্থ হতে হয়। অনেক সময় চুক্তি অনুযায়ী কার্যসম্পাদন না করার ফলে কোম্পানি পর্যায়ক্রমে ক্ষতির দিকে ধাবিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে দেউলিয়া হয়ে পড়ে।
৫. ঋণগ্রহীতা সময়মত ঋণ পরিশোধে বিলম্বের কারণে ঋণদাতার উপর তা বোঝা হয়ে বসে। এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলার জন্য অনেক সময় সদস্যদের ক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়। আবার অনেক সময় উকিল ব্যারিস্টারদের মাধ্যমে আইনের দ্বারস্থ হতে হয়। সে ক্ষেত্রে তাদেরও বিরাট অংকের ব্যয় মিটাতে হয়। এভাবে দুর্দশা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ নৈতিকতার অবক্ষয়

দেশের বিভিন্ন কলকারখানার উপর বিভিন্ন পেশার মানুষের জীবিকা নির্ভর করে তদ্রুপ পরিবেশের ভারসাম্যও অনেকটা প্রভাব ফেলে। তাই যে কোন আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব অর্থনৈতিক মন্দা ও ঋণপ্রাপ্তিতা ও ঋণপরিশোধের দীর্ঘসূত্রিতা থেকে মুক্ত রাখা সকলের দায়িত্ব। ব্যক্তিকেন্দ্রীক স্বার্থচরিতার্থের কবল থেকে সংরক্ষণ করাও অতীব প্রয়োজন। চালকদের নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে দেউলিয়া হয়ে যায়। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই নৈতিকতার অবক্ষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো ঃ

১. অধিকার সংরক্ষণ ও লেনদেনে গড়িমসি ও বিলম্বিতকরণ মূলত কার্যক্ষেত্রে পরিবেশের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যার ফলে উত্তেজনা, অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ধরনের মন্থর গতির কার্যক্রমে বিভিন্ন ইশতিহারে ও তথ্যসমূহে স্বজনপ্রীতি, গোড়ামি অতিরঞ্জন, সীমালংঘন

www.pathagar.com

ইত্যাদির সমাহার পরিলক্ষিত হয়। কোম্পানিগুলোর উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর ক্রেতা হ্রাস পেতে থাকে, মুনাফায় মন্দাভাব দেখা দেয় এবং সুনাম সুখ্যাতি বিনষ্ট হয়।

২. সমাজের বহু লোক বিভিন্ন কোম্পানির উৎপাদনে ও প্রবৃদ্ধির সাথে উৎপ্রোতভাবে জড়িত। সময়মত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে বা কালক্ষেপণ করলে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. ঋণ আদায় ও পাওনা পরিশোধে কর্তৃপক্ষের গড়িমসি কিংবা কালক্ষেপণের বিষয়টি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ফলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার উপর জনসাধারণের মনে অনাস্থার সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক লেন দেন স্থবির হয়ে পড়ে।

কালক্ষেপণের শ্রেণীবিন্যাস

ঋণগ্রহীতার কালক্ষেপণের বিভিন্ন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন কোন সময় আক্ষরিক অর্থেই গড়িমসি করে কালক্ষেপণ করা হয়, আবার কোন সময় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রতারণা করা হয়। অবশ্য কেউ কেউ একান্ত অক্ষম হয়েই কালক্ষেপণ করে। অনেক সময় অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে আত্মসাতের উদ্দেশ্যে চক্রান্ত করা হয়। এ বিষয়গুলো আমরা নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি ঃ

প্রথম প্রকার ঃ অস্বচ্ছল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কালক্ষেপণ

অস্বচ্ছল ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে তাকে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দানের ব্যাপারে সকল ফিকাহবিদ ঐকমত্য পোষণ করেন।[৩২] এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশনা হচ্ছে,

وإن كان ذوعسره فنظرة إلى ميسرة–

'সে (ঋণগ্রহীতা) কখনো যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও।'[৩৩]

কালক্ষেপণ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, 'ধনী তথা স্বচ্ছল ব্যক্তির গড়িমসি (অন্যায়) জুলুম।'[৩৪] অবশ্য কুরআন ও হাদীস থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, দরিদ্র ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্বচ্ছল অবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে। এ ব্যাপারে তাকে বল প্রয়োগ জুলুম, নিপীড়ন ও অপরাধে অভিযুক্ত করা যাবে না। ইমাম শাফিঈ র. বলেন, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে। কারণ রসূলুল্লাহ স. ধনাঢ্য ব্যক্তির কালক্ষেপণ জুলুম সাব্যস্ত করেছেন, অস্বচ্ছল ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন নি।[৩৫] ইমাম আবুল ওয়ালিদ আল বাজী উক্ত মন্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।[৩৬] ইবন রুশদ র. বলেন, ঋণ পরিশোধে সামর্থবান

www.pathagar.com

ব্যক্তির উপর ঋণের দাবি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অস্বচ্ছলতা প্রমাণিত হলে ঋণ আদায়ের জন্য বলপ্রয়োগ সমর্থন যোগ্য হবে না।[৩৭] ইবন হাজার আসকালীন র. বলেন, অক্ষম ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে জুলুম বলা যাবে না। এ বিষয়টি উল্লেখিত হাদীস থেকে প্রতিভাত হচ্ছে।[৩৮] ইবনুল আরাবী আল মালিকী র. বলেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পদশালী না হলে তার কালক্ষেপণকে অপরাধ বলা উচিত নয়।[৩৯] ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্বচ্ছলতা দানের তাৎপর্য প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

'যে ব্যক্তি কোন অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেদিন এমন ছায়ার নিচে আশ্রয় দান করবেন যে দিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না।'[৪০]

'যে ব্যক্তি কোন অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে, তার বোঝা লাঘব করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।'[৪১]

দ্বিতীয় প্রকার ঃ সমস্যাগ্রস্ত ধনবান ঋণগ্রহীতার কালক্ষেপ

সমস্যাগ্রস্ত ধনবান ঋণ গ্রহীতার সম্পদ তার অধিকার থেকে দূরে থাকার কারণে অনিচ্ছাকৃত ভাবে নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে অপরাধী বিবেচিত হবে না।[৪২]

ইমাম নববী বলেন, ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে সম্পদের অনুপস্থিতিতে কিংবা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করলে তা কালক্ষেপণ হবে না। কারণ রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী مطل الغنى ظلم বাক্যে (غنى) অর্থ হচ্ছে আদায়ে সামর্থবান হওয়া।[৪৩]

তৃতীয় প্রকার ঃ সমস্যাগ্রস্ত নয় এমন স্বচ্ছল ঋণগ্রহীতার কালক্ষেপণ

সমস্যাগ্রস্ত নয় এমন স্বচ্ছল ঋণগ্রহীতার কালক্ষেপণ শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। ঋণ পরিশোধে গড়িমসির কারণে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।[৪৪] ইমাম সাবকী ও হায়ছামী স্ব স্ব গ্রন্থে এরূপ ব্যক্তির কালক্ষেপণকে জঘন্যতম অন্যায় ও কবীরা গুনাহ আখ্যা দিয়েছেণ।[৪৫] ইমান ইবন হাযম র., এসব ব্যক্তিকে শায়েস্তা করার জন্য হাতের সাহায্য নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।[৪৬] তিনি আরো বলেন, এসব কালক্ষেপণকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত হবে এবং এরা নিঃসন্দেহে ফাসিক।[৪৭]

উপসংহার ঃ বক্ষ্যমান প্রবন্ধে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পেল তা হলো, কুরআন ও হাদীসের আলোকে সম্পদশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি দূরে অবস্থাকালীন সময়ে তার সম্পদ হাতের নাগালে না আসা পর্যন্ত কালক্ষেপণ অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না। আরো আলোচিত হলো, মন্দ ঋণের একটা বড় কারণ হলো বিলাসিতা সৌখিনতা অসৎ ইচ্ছায় ঋণ করা। অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে স্বচ্ছল অবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত অবকাশের

www.pathagar.com

প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সামর্থবান ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কালক্ষেপণ জঘন্য অপরাধ বলা হয়েছে। আমাদেরকে ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণের মন্দ চর্চা থেকে আল্লাহ্ যেন মুক্ত রাখেন। আমীন।।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-জামি' আস সাহীহ আল-বুখারী (ঢাকা রশীদিয়্যাহ্ লাইব্রেরী, তা.বি), খণ্ড ১, পৃ. ১৫।
২. আল-আযহারী, আল-যাহির, খণ্ড ২৩১।
৩. ড. রুহী আল-বা'লা বাক্কী, আল-মাওরিদ (ARABIC ENGLISH) বৈরুত : দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯৩ খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ১১০৮-১১০৯।
৪. ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকাইসিল লুগাহ, খণ্ড ৫, পৃ. ২৩১।
৫. আল-মিছবাহুল মুনীর, খণ্ড ২, পৃ. ৭০০।
৬. ইয়াহয়া ইবন শরফুদ্দীন আন-নাবভী শারহু সহীহ মুসলিম। খণ্ড ৪, পৃ. ৪২৩; মোল্লা 'আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৩৭।
৭. ড. নাসিয়াহ্ হাম্মাদ, কাদায়া ফিকহিয়্যাহ্ মু'আছারাহ, পৃ. ৩২২।
৮. ইবন মানযূর, লিসানুল আরব (কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৬/১৪২৭), খণ্ড ১০, পৃ. ৪৯।
৯. আল-কামূসুল মুহীত, পৃ. ১১২৯।
১০. 'আল্লামা জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃ. ৪৮।
১১. 'আব্দুল 'আযীয আল-বুখারী, কাশফুল আসরার, খণ্ড ৩, পৃ. ১৩৪।
১২. 'আল্লামা সানহুরী, মাছাদিরুল হক ফিল ফিকহিল ইসলামি, খণ্ড ১, পৃ. ৯।
১৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত।
১৪. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ্ আল-কুয়েতিয়্যাহ্ (কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ, ২০০৩/১৪২৪), খণ্ড ২১, পৃ. ১১০
১৫. ইমাম আহমাদ ইবন হান্বল, আল-মুসনাদ (কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৫/১৪২৬), খণ্ড ২৪, পৃ. ২৪১।
১৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৫।
১৭. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'আরিজ : ১১-১৪।
১৮. আবু আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
১৯. নাসা'ঈ, পৃ. ৩১৪।
২০. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআছ আস-সিজিস্তানী, সুনান আবী দাউদ (রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২১/২০০), খণ্ড ৩, পৃ. ৬৬৭।
২১. কাশফুল আসরার, খণ্ড ৪, পৃ. ১৩৪; তাওসীহ লি মাতানিত তানকীব, খণ্ড ১, পৃ. ১৫০।
২২. কাশফুল আসরার, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৪, পৃ. ১৩৫।
২৩. আল কাররাফী, আল ফুরূক, খণ্ড ১, পৃ. ২৫৬।

www.pathagar.com

২৪. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাউস্যুতুল ফিকহিয়্যাহ্ আল-কুয়েতিয়্যাহ্, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১৮, পৃ. ১৮।
২৬. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ১৭৯।
২৭. তাইসীরুত তাহরীর, খণ্ড ২, পৃ. ১৭৪।
২৮. আল-মিছবাহুল মুনীর, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১১২।
২৯. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা: ১৮৮।
৩০. মুহাম্মদ 'আবদালী আল-মালিকী, আল-মাদখাল, খণ্ড ৪, পৃ. ৫৯।
৩১. আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল বুখারী প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
৩২. আল-মাবসূত, খ্. ২০, পৃ. ৮৮-৮৯; আল-খতীব আশ-শারীনী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-মুগনী আল-মুহতাজ (কায়রো : মাকতাবাহ তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি), খণ্ড ৩, পৃ. ১১৫।
৩৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ২৮০।
৩৪. আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত।
৩৫. ইমাম শাফি'ঈ, কিতাবুল উম্ম (কায়রো : মাকতাবাহ তাওফীকিয়্যাহ্ তা. বি), খণ্ড ৩, পৃ. ২০৬।
৩৬. ইমাম আবুলওয়ালীদ আল-বাজী আল-মুন্তাকা, খণ্ড ৫, পৃ. ৬৬; তাকীউদ্দীন ইবনু দাকীকিল ঈ'দ, ইহকামুল আহকাম শারহু 'উসদাতিল আহকাম (কায়রো : মাকতাবাতুস-সুন্নাহ, ১৯৯৭/১৪১৮), খণ্ড ২, পৃ. ১৪৫।
৩৭. 'আল্লামা ইবন রুশদ, আল-মুকাদ্দামাতুল মুআহ্হাদাত, খণ্ড ২, পৃ. ৩০৬।
৩৮. ইবন হাজার 'আসকালানী, ফাতহুল বারী (কায়রো : মাকতাবাতুস সফা, ২০০৩/১৪২৪), খণ্ড ৪, পৃ. ৪৬৬।
৩৯. ইবনুল আরাবী আল-মালিকী, আরিযাতুল আহওয়াযী শারহুত তিরমিযী, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৭।
৪০. আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আল জামি'আস-সাহীহ আল-মুসলিম (ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি), খণ্ড ২, পৃ. ৭৫।
৪১. ইমাম আহমাদ ইবন হান্বল, আল-মুসনাদ প্রাগুক্ত, খণ্ড ৫, পৃ. ১৪৯।
৪২. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ্ আল-কুয়েতিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩৮, পৃ. ১১৬।
৪৩. ইমাম শারফুদ্দীন ইয়াহ্য়া আন-নববী, শারহু মুসলিম, খণ্ড ১০, পৃ. ২২৭।
৪৪. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাউসূতুল ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩৮, পৃ. ১১৭।
৪৫. মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৩/১৪২৩), খণ্ড ৪, পৃ. ৬৬৪।
৪৬. ইবন হাযম, আল-মহল্লী (কায়রো : মাকতাবু দারিত্তুরাছ ২০০৫/১৪২৬), খ্. ৬, পৃ. ৪৮১; ইবনুল আরাবী, আরিযাতুল আহওয়াযী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৬
৪৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৮, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭-৯২

যেনা-ব্যভিচার সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের বিধান ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি

মুহাম্মদ মূসা

॥ পাঁচ ॥

ইসলামী শরীয়তে যেনার অপরাধ সংশ্লিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ কোড বা বিধিবদ্ধ আইন ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামী আইনবেত্তাগণ (ফকীহগণ) কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়ে খুঁটিনাটিসহ এই আইন ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাদের প্রণীত আইনের গ্রন্থাবলীতে (ফিক্হ) হুদূদ সংক্রান্ত অধ্যায়ে কিতাবুয-যিনা শীর্ষক অনুচ্ছেদে।

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সর্বাধিক সম্মানিত সৃষ্টি হিসাবে ঘোষণা করে বংশানুক্রমে তাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য বৈবাহিক বন্ধনের পবিত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন এবং বিবাহ বহির্ভূত অনাচারে লিপ্ত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তাই ইসলামে যেনা (ব্যভিচার) যুগপতভাবে একটি নৈতিক, সামাজিক ও কঠোর দণ্ডযোগ্য গর্হিত অপরাধ। এই অপরাধ থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنى اِنه كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيلاً.

'তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না, তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।'[১]

আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ব্যক্তিগণের উন্নত নৈতিক চরিত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ. اِلاَّ عَلى اَزْوَاجِهِمْ.....فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَالِكَ فَاُولئِكَ هُمُ الْعدُوْنَ.

'যারা (ঈমানদারগণ) নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে, হেফাজত করে নিজেদের স্ত্রীদের.... ব্যতীত। আর কেউ এদের ব্যতীত অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী।'[২]

وَعِبَادُ الرَّحْمنِ...... وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلهًا اخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ.

www.pathagar.com

'দয়াময় রহমানের বান্দা তারাই.... যারা আল্লাহ্র সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং যেনায় লিপ্ত হয় না।'[৩]

'যেনার নিকটবর্তী হয়ো না' অর্থাৎ যে ধরনের উপাদান, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা মানুষকে অবৈধ যৌনাচারে (যেনায়) লিপ্ত হতে প্ররোচিত করতে পারে সেই ধরনের উপাদান, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করতেও আয়াতাংশে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত তাই প্রথম পদক্ষেপেই নারী-পুরুষের শালীন পোশাকের সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে এবং তাদের অবাধ ও অযাচিত মেলামেশাকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছে।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذلِكَ اَزْكى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ.

'আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আপনি মুমিন মহিলাদের বলুন, তারাও যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।'[৪]

অপরের বাড়ি-ঘরে অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلى اَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ..... وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের বসতঘর ব্যতীত অন্য কারো বসত ঘরে গৃহবাসীদের বিনা অনুমতিতে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এই ব্যবস্থাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।.... যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও; তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা করো সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।'[৫]

বিশেষ করে মহিলাদের অশালীন পোশাক, বেপরোয়া চালচলনের ব্যাপারে সতর্কতামূলক নির্দেশ দেয়া হয়েছে (এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধে আলোচনা করা হবে)।

www.pathagar.com

চরিত্র- নৈতিকতার হেফাজত ও যেনার মত গর্হিত অপকর্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহযোগ্য নারী-পুরুষ ও বিধবা-বিপত্নিক সকলকে বিবাহ্ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬]

মহানবী স. বলেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ্ করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। সেটাই তার দৃষ্টিকে সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী। আর যার সেই সামর্থ্য নেই সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। সেটাই তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।'[৭]

এভাবে একটি সমাজকে নৈতিক প্রশিক্ষণ দান করে এবং অশ্লীলতার প্রসারক উপায়-উপকরণ প্রতিরোধের পর রসূলুল্লাহ স. ব্যভিচারের দণ্ডবিধি জারি করেছেন এবং কঠোর সতর্কতামূলক আদালতী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। একদিকে এই অপরাধী প্রমাণের জন্য চারজন মুসলিম পুরুষ সাক্ষীর শর্তারোপ করেছেন, অপরদিকে কেউ বিনা প্রমাণে কারো বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করলে অভিযোগকারীর জন্যও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

যেনার সংজ্ঞা

বালেগ ও বুদ্ধিমান দু'জন নারী ও পুরুষের পরস্পরের সাথে বৈবাহিক বন্ধন ব্যতীত স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে একজনের প্রজনেন্দ্রিয় অপরজনের প্রজনেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করানো হলে তাকে যেনা বলে। পুরুষাঙ্গ স্ত্রী অঙ্গে প্রবেশ করানোই যেনা সংঘটনের জন্য যথেষ্ট। যেনা (زنا) শব্দের পারিভাষিক অর্থ "নিজ স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অপর নারী বা পুরুষের সাথে যৌনকর্ম"। ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে, "এমন কোন নারীর সাথে তার সম্মতিতে তার যৌনাঙ্গে কোন পুরুষের সঙ্গমক্রিয়াকে যেনা বলে, যে তার স্ত্রীও নয় এবং তার স্ত্রী হওয়ার সন্দেহও বিদ্যমান নেই।"[৮]

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে হদ্দযোগ্য যেনা সাব্যস্ত করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকা জরুরি।

(১) সঙ্গমকারী নারী-পুরুষ পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নয়; (২) উভয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক (বালেগ); (৩) উভয়ে মুসলিম. (৪) উভয়ে সুস্থ বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন; (৫) উভয়ে জীবিত; (৬) সঙ্গমক্রিয়া উভয়ের স্বেচ্ছা-সম্মতিতে হয়েছে; (৭) দুইজনের একজন পুরুষ ও অপরজন নারী এবং (৮) পুরুষাঙ্গ জননেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে। বর্ণিত আটটি শর্তের কোন একটি শর্ত না পাওয়া গেলে যৌনকর্মটি হদ্দযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য না হয়ে বরং তা'যীরযোগ্য অপরাধ গণ্য হবে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তদনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি হবে।

যেনা ও হদ্দযোগ্য যেনা

যে কোন ধর্মের নারী-পুরুষের অবৈধ যৌনাচার ইসলাম ধর্মমতে সাধারণত যেনা হিসাবে গণ্য, তবে তা হদ্দযোগ্য যেনা নাও হতে পারে। হানাফী মাযহাবের

www.pathagar.com

ফকীহগণের মতে কেবল মুসলিম নারী বা পুরুষের অবৈধ যৌনাচারই 'হদ্দযোগ্য যেনা' হিসাবে গণ্য। অর্থাৎ হানাফী মাযহাবমতে হদ্দযোগ্য যেনা প্রমাণিত হওয়ার জন্য অবৈধ সঙ্গমে লিপ্ত নারী বা পুরুষের মুসলমান হওয়াও একটি শর্ত। কোন মুসলিম পুরুষ যদি কোন অমুসলিম নারীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয় তবে এ ক্ষেত্রে ঐ পুরুষের অপরাধটি হদ্দযোগ্য যেনা এবং ঐ নারীর অপরাধটি শুধু যেনা হিসাবে গণ্য হবে (এবং পাল্টাভাবে)।

হদ্দ শব্দের অর্থ

আরবী হদ্দ (حَدّ) শব্দটির অর্থ সীমা, সীমানা, প্রান্তদেশ, শেষ প্রান্ত, ধাপ, বাধা, বাধাদান, প্রতিরোধ ইত্যাদি। এ শব্দ থেকেই 'আল-হাদ্দাদ লিল-বাওয়াব' (الحداد للبواب) অর্থাৎ 'দ্বাররক্ষী' নিষ্পন্ন হয়েছে। কারণ সে লোকজনকে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। আইনের পরিভাষায় শব্দটির অর্থ 'নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি'। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সেই অপরাধসমূহ ও তার শাস্তিকে একযোগে হদ্দ বলা হয়। এই অপরাধগুলো হলো– (১) যেনা, (২) কায্ফ (যেনার মিথ্যা অভিযোগ), (৩) চুরি, (৪) ডাকাতি, (৫) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ, (৬) মাদক গ্রহণ ও (৭) ইরতিদাদ (ইসলাম ধর্মত্যাগ)।

হদ্দের আওতাভুক্ত অপরাধ দ্বারা সামগ্রিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শাস্তি কার্যকর করলে সমাজ উপকৃত হয়। তাই হদ্দকে আল্লাহ্র অধিকার (public Right) বলা হয়েছে।[৯]

অমুসলিম সম্প্রদায় ও যেনার শাস্তি

ইসলাম ধর্মানুসারী ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের কোন ব্যক্তি যেনায় লিপ্ত হলে সে হদ্দযোগ্য কিনা–এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ আছে। হানাফী ফকীহগণের মতে এক্ষেত্রে তারা নিজ নিজ ধর্মের বিধানমতে শাস্তিযোগ্য হবে। অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণের মতে তারাও হদ্দযোগ্য হবে। মহানবী স. একজোড়া ইহুদী নারী-পুরুষকে যেনার অপরাধে হদ্দের আওতায় শাস্তি দিয়েছেন–এ হাদীসকে তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে পেশ করেন। হানাফীগণ এর জবাবে বলেন, তাওরাতের বিধান মোতাবেক তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, যদিও এই অপরাধের শাস্তি ইহুদী, খৃস্ট ও ইসলাম ধর্মে একইরূপ (গত সংখ্যায় ঘটনাটি আলোচিত হয়েছে)।

অপরাধ প্রমাণ

তিনভাবে যেনার অপরাধ প্রমাণিত হতে পারে। (ক) বালেগ ও বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন চারজন মুসলিম পুরুষ চাক্ষুষভাবে অর্থাৎ সরাসরি সচক্ষে একটি পুরুষ লোককে একটি নারীর জননেন্দ্রিয়ে তার পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করিয়ে যেনা করতে দেখেছে বলে আদালতের সামনে একযোগে সাক্ষ্য প্রদান করলে; (খ) অপরাধী আদালতে

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে অপরাধ স্বীকারোক্তি করলে, অথবা (গ) স্বামীহীনা নারী গর্ভবতী হলে।

সাক্ষীর সংখ্যা চারজনের কম হলে হদ্দযোগ্য যেনা প্রমাণিত হবে না। উল্টো সাক্ষীগণই যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপের দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং তাদেরকে শাস্তিভোগ করতে হবে। সাক্ষী সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَالتِى يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ.

'তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা যেনায় লিপ্ত হয় তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন (পুরুষ) সাক্ষী তলব করবে।'[১০]

والَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ....

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না.... ।'[১১]

لَوْلاَ جَاءُوْا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ.

'তারা কেন এই ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি?'[১২]

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করলে মহানবী স. তাকে বলেন ঃ

اِئْتِ بِاَرْبَعَةٍ يَّشْهَدُوْنَ عَلى صِدْقِ مَقَالَتِكَ.

'চারজন সাক্ষী নিয়েএসো, যারা তোমার বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।'[১৩]

স্বীকারোক্তির দ্বারাও যেনা প্রমাণিত হয়। অপরাধী আদালতে উপস্থিত হয়ে চারবার স্বীকারোক্তি করলেও হদ্দযোগ্য যেনার অপরাধ প্রমাণিত হয়। মায়েয ইবনে মালেক রা. রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যেনায় লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে চারবার স্বীকারোক্তি করলে তিনি বিভিন্নভাবে জেরা করার পর তার উপর হদ্দ কায়েম করেন।[১৪] তবে এক্ষেত্রে শাস্তি কার্যকর করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অপরাধী ইচ্ছা করলে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে এবং শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে।[১৫] ইমাম মালেক, শাফিঈ ও হাসান বসরী র.-এর মতে শাস্তি কার্যকর করার জন্য একবারের স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও আহমাদ র.-এর মতে চারের কম সংখ্যকবার স্বীকারোক্তি করলে হদ্দ কার্যকর হবে না। কারণ মায়েয চারবার স্বীকারোক্তি করার পরই রসূলুল্লাহ স. তার উপর হদ্দ কার্যকর করেন।[১৬]

অবিবাহিত বা স্বামীহীনা নারীর গর্ভধারণেও যেনা প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু তা শাস্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। ইমাম মালেক র. তা যেনা প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করলেও হানাফী মাযহাবের ফকীহগণসহ অধিকাংশ

www.pathagar.com

ফকীহ-এর মতে যেনার মত একটি কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য কুমারী বা স্বামীহীনার গর্ভধারণ যথেষ্ট নয়। তা যেনায় লিপ্ত হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করে মাত্র। চারবার অবৈধ গর্ভের স্বীকারোক্তি দ্বারাই কেবল তা হদ্দযোগ্য হতে পারে।[১৭]

যেনার সন্দেহ

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, স্বামীহীনার গর্ভধারণ যেনার অপরাধে লিপ্ত হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করে। একজোড়া বেগানা নারী-পুরুষের কোন ব্যক্তি কোন নারীর নামোল্লেখ করে যদি তার সাথে যেনা করার স্বীকারোক্তি করে এবং সংশ্লিষ্ট নারী তা অস্বীকার করে তবে শুধু পুরুষলোকটিই অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং শাস্তিযোগ্য হবে।

عن سهل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم ان رجلا اتاه فاقرعنده انه زنى بامراة سما ها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المرأة فسالها عن ذلك فانكرت ان تكون زنت فجلده الحد وتركها.

'সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে নবী সা.-এর নিকট থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে একটি স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ করে তার সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তি করে। রসূলুল্লাহ স. সেই নারীর নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে যেনায় লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। অতএব তিনি পুরুষ লোকটিকে হদ্দের আওতায় বেত্রাঘাত করেন এবং স্ত্রীলোকটিকে রেহাই দেন।'[১৮]

এক যুবক শ্রমিক নিয়োগকর্তার স্ত্রীর সাথে যেনা করলে বিষয়টি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট উত্থাপন করা হয়। তিনি শ্রমিক যুবককে এক শত বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেন এবং উনায়স আল-আসলামী রা.-কে স্ত্রীলোকটির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করতে বলেন– সে অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়েছে কি-না। যদি সে স্বীকারোক্তি করে তবে তাকে রজম করতে হবে। অতএব সে অপরাধের স্বীকারোক্তি করলে তাকে রজম করা হয়।[১৯]

নির্জনে একান্তে অবস্থানও যেনা সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় ইসলামী আইনের একটি মূলনীতি হলো اِدْفَعُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ "সন্দেহের ক্ষেত্রে হদ্দ কার্যকর করা স্থগিত রাখো।"[২০]

اِدْفَعُوا الْحُدُوْدَ مَا وَجَدْتُّمْ لَهَا مَدْفَعًا.

"যতদূর সম্ভব হদ্দ কার্যকর করা প্রতিরোধ করো।"[২১]

www.pathagar.com

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرجفخلوا سبيله فان الامام ان يُخْطِىءَ فى العفو خير من ان يخطئ فى العقوبة.

'রসূলুল্লাহ স. বলেন, যতদূর সম্ভব তোমরা মুসলমানদের থেকে হদ্দ প্রতিহত করো। যদি রেহাই দেয়ার কোন উপায় থাকে তবে তাকে তার পথে ছেড়ে দাও (অভিযোগ থেকে রেহাই দাও)। কেননা ইমামের (রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের) ভুলবশত শাস্তি প্রদান করার তুলনায় ভুলবশত ক্ষমা করে দেয়া উত্তম'।[২২]

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قَالَ تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب.

'তোমাদের মধ্যে সংঘটিত হদ্দের অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে থাকো। তা আমার নিকট (আদালতে) পৌঁছলে শাস্তিদান অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে'।[২৩]
অতএব সন্দেহ সৃষ্টিকর অবস্থায় যেনার শাস্তি স্থগিত হয়ে যায়। তবে উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকলে বিচারক 'তাযী'র (সাধারণ দণ্ডবিধি)-এর আওতায় অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন।

রসূলুল্লাহ স.-ও রেহাই দেয়ার চেষ্টা করতেন

কোন লোক রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তি করলেও তিনি তা যাচাই না করে তাকে শাস্তি দিতেন না। প্রথমেই তিনি অপরাধীকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করতেন অথবা এমন পন্থায় তাকে জেরা করতেন যাতে সে রেহাই পেতে পারে। আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, 'আমি নবী স.-এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি হদ্দযোগ্য (কঠোর দণ্ডনীয়) অপরাধ করেছি, তা আমার উপর কার্যকর করুন। রাবী বলেন, তিনি তাকে তার অপরাধের ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হলে সে নবী স.-এর সাথে নামায পড়লো। নবী স. নামায শেষ করলে পর লোকটি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি হদ্দযোগ্য অপরাধ করেছি। অতএব আমার উপর আল্লাহর কিতাব কার্যকর করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এইমাত্র আমাদের সাথে নামায পড়োনি? সে বললো, হাঁ, পড়েছি। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমার গুনাহ বা তোমার হদ্দ ক্ষমা করেছেন।'[২৪]
মায়েয ইবনে মালেক রা. রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় যেনার স্বীকারোক্তি করলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নেন এবং বলেন, 'আরে যাও! চলে যাও, আল্লাহর নিকট মাফ চাও, তওবা করো।' তিনি তিনবার এভাবে বলেন। চতুর্থবারে

www.pathagar.com

তিনি জেরা করেন–হয়ত তুমি তাকে চুমা দিয়েছ, ধরাধরি করেছ, কুদৃষ্টিতে তাকিয়েছে।' তুমি কি তার সাথে একই বিছানায় শয়ন করেছ, সঙ্গম করেছ, তোমার লজ্জাস্থান তার লজ্জাস্থানে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়েছ–যেভাবে সুরমা শলাকা সুরমাদানীর মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যায়? হয়ত তুমি জানো না যেনা কি? হয়ত তুমি অবিবাহিত অথবা মাদক গ্রহণ করেছ? হয়ত তুমি পাগল। তিনি তার মুক্তিদাতা মনিব আসলাম গোত্রীয় হাজ্জাল ইবনে নুআইম রা.-কে বললেন, 'তুমি যদি তার বিষয়টি গোপন রাখতে তবে সেটাই তোমার জন্য কল্যাণকর হতো।'[২৫]

জোরপূর্বক যেনা (ধর্ষণ)

কোন ব্যক্তির সাথে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে যেনা করলে বল-প্রয়োগকারী দোষী সাব্যস্ত হবে এবং অসহায় ব্যক্তি নিরপরাধ গণ্য হবে। ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে নারীদের জোরপূর্বক যেনায় লিপ্ত হতে বাধ্য করা হতো। অসহায় নারীদের তা উপেক্ষা করার কোন উপায় ছিলো না। ইসলাম তাদের এই ঘৃণ্য তৎপরতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং অসহায় নারীদের নিরপরাধ সাব্যস্ত করে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

'তোমরা তোমাদের যুবতী বা দাসীদের, তারা তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধনলিপ্সায় ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না। যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।[২৬]

"মহানবী স.-এর যুগে এক মহিলা অন্ধকারে (মসজিদে নববীতে) নামায পড়তে যাওয়ার পথে ধর্ষণের শিকার হয়। সে জোরে চীৎকার করলো এবং লোকটি দ্রুত চলে গেলো। এক ব্যক্তিকে তার নিকট দিয়ে যেতে দেখে সে তাকে বললো, ঐ ব্যক্তি আমাকে ধর্ষণ করেছে। ইতিমধ্যে একদল মুহাজির সাহাবীও এসে উপস্থিত হলে মহিলা বললো, ঐ লোক আমাকে ধর্ষণ করেছে। তারা দ্রুত গিয়ে যেই লোকটি তাকে ধর্ষণ করেছে বলে সন্দেহ করলো তাকে ধরে ফেললো। তারা তাকে মহিলার নিকট নিয়ে এলে সে বললো, হ্যাঁ, এই লোকই। তারা তাকে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট উপস্থিত করলো। তিনি তার সম্পর্কে রায় প্রদান করতেই আসল অপরাধী উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! অপরাধী আমি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আগেই উপস্থিত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? সে বললো, লোকের ভীড় ঠেলে সামনে আসতে বিলম্ব হয়েছে। তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন, তুমি চলে যাও, আল্লাহ তো তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং তিনি অপর লোক সম্পর্কেও

www.pathagar.com

উত্তম মন্তব্য করলেন। তিনি প্রকৃত দোষী সম্পর্কে বললেন, তোমরা তাকে রজম করো। পরে তিনি বলেন, লোকটি এমন তওবা করেছে, যদি মদীনাবাসীরা এরূপ তওবা করতো তবে তাদের সেই তওবা কবুল করা হতো।[২৭]

তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সংগম

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে শরীয়তসম্মত পন্থায় তিন তালাক দেয়ার পর ইদ্দত শেষে শরীয়তসিদ্ধ পন্থা ব্যতীত তাকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে আনলে, অতঃপর তার সাথে সঙ্গম করলে উক্ত সঙ্গমক্রিয়া হদ্দযোগ্য যেনারূপে গণ্য হবে এবং উভয়েই যেনার শাস্তি ভোগ করবে। কেননা তিন তালাক সংঘটিত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায় এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর্বে তারা যে অবস্থানে ছিল সেই অবস্থায় ফিরে যায়। স্ত্রীলোকটি স্বাধীনভাবে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে এবং পূর্ব-স্বামীর তাতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার থাকে না। এ বিষয়ে চার মাযহারের সকল ইমাম, এমনকি শী'আ ইমামগণও একমত।[২৮] এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে স্পষ্ট বিধান দেয়া হয়েছে।[২৯]

যেনার মিথ্যা অভিযোগ (কায্ফ)

কোন ব্যক্তি যদি কোন নারী বা পুরুষের বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ দায়ের করে তবে তাকে বালেগ ও বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন চারজন মুসলিম পুরুষ সাক্ষী দ্বারা তা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় সে কায্ফ-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে।[৩০] অভিযোগকারী নাবালেগ, পাগল ও চরিত্রহীন বলে সমাজে কুখ্যাত নারী-পুরুষের প্রতি যেনার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করলে তা কায্ফ-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে না। কারো প্রতি যেনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপকে আইনের পরিভাষায় 'কায্ফ' বলে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ

স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করলে এই অনুচ্ছেদের সাধারণ বিধান অনুযায়ী চারজন সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় সে কায্ফ-এর দণ্ডে দণ্ডিত হবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তার অনুকূলে চারজন সাক্ষী না থাকে, তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে কুরআন মাজীদে বিবৃত বিশেষ পন্থায় আদালতের সামনে শপথ করতে হবে।[৩১] আইনের পরিভাষায় একে 'লি'আন' বলে। স্বামী শপথ করতে অস্বীকার করলে 'কায্ফ'-এর দণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং স্ত্রী শপথ করতে অস্বীকার করলে যেনার দণ্ডে দণ্ডিত হবে। উভয়ে শপথ করলে তাদের বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।[৩২]

যেসব ক্ষেত্রে যেনা হদ্দযোগ্য নয়

পাত্রভেদে যেনার কতগুলো অপরাধ হদ্দযোগ্য যেনার আওতাভুক্ত নয়, যদিও অবস্থাভেদে তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধ গণ্য হতে পারে। যেমন পাগল,

www.pathagar.com

নাবালেগ, মৃত ব্যক্তি, পশু ইত্যাদির সাথে অনুষ্ঠিত যেনার অপরাধ হদ্দযোগ্য নয়। এসব ক্ষেত্রে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা মতে শাস্তি নির্ধারণ করবেন।

যেনার শাস্তি

যেনার শাস্তি দুই ভাগে বিভক্ত অপরাধীর অবস্থাভেদে। অপরাধী বিবাহিত হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং অবিবাহিত হলে এক শত বেত্রাঘাত। বিবাহিত বলতে, তার স্ত্রী বা স্বামী ছিল, বর্তমানে নেই অথবা আছে। অবিবাহিত অপরাধীর শাস্তি আল-কুরআন কর্তৃক নির্ধারিত।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

'যেনাকারিণী ও যেনাকারী, তাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করো। আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনে থাকো। মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।'[৩৩]

রসূলুল্লাহ স.-ও অবিবাহিত অপরাধীকে এক শত বেত্রাঘাত করেছেন। ইতিপূর্বে উক্ত হাদীসসমূহ তার প্রমাণ। মহানবী স. বলেন ঃ

اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ.

'অবিবাহিত নারী-পুরুষের যেনার শাস্তি এক শত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন।'[৩৪]

বিবাহিত অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এই শাস্তির কথা কুরআন মজীদে উক্ত হয়নি। আল্লাহর নির্দেশে নবী স. তা নির্ধারণ ও কার্যকর করেছেন। মহানবী স. বলেন ঃ

اَلثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

'বিবাহিত নারী-পুরুষের যেনার শাস্তি এক শত বেত্রাঘাত ও মৃত্যুদণ্ড।'[৩৫]

হানাফী মাযহাব অবিবাহিতের ক্ষেত্রে নির্বাসন দণ্ড এবং বিবাহিতের ক্ষেত্রে শত বেত্রাঘাত সমর্থন করে না। এই মাযহাব তাদের মতের সপক্ষে রসূলুল্লাহ্ স.-এর অন্যান্য হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে কেপিটাল পানিশমেন্টের সাথে অন্য কোন ধরনের শাস্তি যোগ করা যায় না। মহানবী স. মায়েয আসলামী, গামেদিয়া ও শ্রমিক নিয়োগকর্তার স্ত্রীকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু তার সাথে অন্য কোন ধরনের শাস্তি যোগ করেননি।[৩৬]

www.pathagar.com

যেনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপকারীর শাস্তি আশি কশাঘাত। মহান আল্লাহ্র বাণী

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُم ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَّاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তোমরা তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না, তারা পাপাচারী।'[৩৭]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমার চারিত্রিক পবিত্রতার বর্ণনা সম্বলিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী স. মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন এবং আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনান। তিনি মিম্বার থেকে নেমে এসে দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সম্পর্কে নির্দেশ দিলে লোকজন তাদের উপর দণ্ড কার্যকর করে।[৩৮]

বিচার অনুষ্ঠান ও শাস্তি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান

শরীয়তের বিধানমতে যে কোন মুসলিম দেশের সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি সরকার বা প্রশাসন ব্যবস্থা থাকা একান্ত ফরয। রসূলুল্লাহ স. হিজরত করে মদীনায় পৌছার পর সর্বপ্রথম ব্যাপক ভিত্তিক একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সরকার বা তার বিচার বিভাগই অপরাধসমূহের বিচার ও তার শাস্তি কার্যকর করতে পারে।

ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তিবিশেষকে আইন হাতে তুলে নেয়ার এখতিয়ার দেয় না। জনগণ অভিযোগ দায়ের করতে পারে। কিন্তু তার বিচার ভার ও শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত। আমরা রসূলুল্লাহ স. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে, এমনকি দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে এই ব্যবস্থাই কার্যকর দেখতে পাই। অতএব ইসলামী শরীয়তমতে জনগণের কর্তব্য হচ্ছে–অপরাধীকে বিচার বিভাগে সোপর্দ করা, তাৎক্ষণিক শাস্তি দেয়া নয়।

দণ্ডিতের প্রতি মানবিক আচরণ

রসূলুল্লাহ স. দণ্ড কার্যকর করার পর দণ্ড ভোগকারীর প্রতি নেহায়েতই মানবিক আচরণ করেছেন। এক ব্যক্তি মদপান করলে রসূলুল্লাহ স. তাকে শাস্তি দেন। উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ। তাকে অভিশপ্ত করুন। নবী স. বললেন, তাকে অভিশাপ দিও না। আল্লাহ্র শপথ! আমার জানা মতে নিশ্চয়ই সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে।[৩৯]

আবু হুরায়রা রা. বলেন, এক মদ্যপকে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে প্রহার করার নির্দেশ দিলেন। অতএব আমাদের কেউ তাকে জুতা

www.pathagar.com

দিয়ে, কেউ হাত দিয়ে এবং কেউ কাপড় দিয়ে তাকে প্রহার করলো। সে ফিরে যেতে থাকলে এক ব্যক্তি বললো, কেমন হলো, আল্লাহ্ তাকে অপদস্থ করেছেন। সাথে সাথে রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে তোমরা শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।[৪০]

মায়েয ইবনে মালেকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ

استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لوقسمت بين امة لوسعتهم.

'তোমরা মায়েয ইবনে মালেকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তারা বলেন, আল্লাহ্ মায়েয ইবনে মালেককে ক্ষমা করুন। রসূলুল্লাহ স. বলেন, অবশ্যই সে এমন তওবা করেছে যে, একটি উম্মতের মধ্যে বণ্টন করে দিলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে।'[৪১]

গামেদ গোত্রীয় নারীর শাস্তি কার্যকর করার পর রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ

لقدتابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفرله.

'অবশ্যই সে এমন তওবা করেছে যে, কোন কর আদায়কারী অনুরূপ তওবা করলে অবশ্যই তাকে ক্ষমা করা হতো।'[৪২]

রসূলুল্লাহ স. উপরোক্ত নারীর জানাযার নামাযও পড়েন। হযরত উমার রা. তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি তার জানাযার নামায পড়বেন। অথচ সে যেনা করেছে! তিনি বলেন ঃ

لقد تابت توبة لوقسمت بين سبعين من اهل المد ينة لوسعتهم وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى.

'সে অবশ্যই এমন তওবা করেছে যে, তা মদীনার সত্তরজন লোকের মধ্যে বণ্টন করে দিলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। যে নারী আল্লাহ্ তা'আলার জন্য তার জীবনটাকে বিলিয়ে দিয়েছে, তুমি কি তার চেয়ে অধিক উত্তম তওবা দেখতে পাও।'[৪৩]

মায়েয ইবনে মালেকের ঘটনার পর নবী স. তাঁর দু'জন সাহাবীর মধ্যকার একজনকে অপরজনকে বলতে শুনলেন, দেখো, এই লোকটিকে-আল্লাহ্ যার বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু নফস তাকে ত্যাগ করেনি যতক্ষণ না কুকুরের মত পাথরের আঘাতে শেষ হয়েছে। তিনি নীরব থাকলেন, অতঃপর কিছুক্ষণ সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। পথিমধ্যে উপরের পা তোলা একটি গাধার লাশের নিকট পৌঁছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অমুক অমুক কোথায়? তারা বললো, আমরা এই যে, ইয়া রসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তোমরা এসো, এই মরা গাধার গোশত

www.pathagar.com

খাও। তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! কে তা খেতে পারে? তিনি বলেন, তোমরা এইমাত্র তোমাদের ভাইয়ের যেভাবে দোষচর্চা করেছো তা এই মরা গাধার গোশত খাওয়ার চেয়েও গুরুতর। আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! নিশ্চয়ই সে এই মুহূর্তে জান্নাতের ঝর্ণায় আনন্দে সাতার কেটে বেড়াচ্ছে।'[৪৪]

হদ্দ কার্যকর করার উপকারিতা

একদিকে রসূলুল্লাহ স. হদ্দের অপরাধসমূহ যথাসম্ভব গোপন রাখার পরামর্শ দিয়েছেন, অপরদিকে যাদের উপর হদ্দ কার্যকর করা হয়েছে– আল্লাহর দরবারে তাদের উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন, যা পূর্বোক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রতিভাত হয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ স. পার্থিব জীবনেও মানবজাতির জন্য হদ্দ কার্যকর করার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوْا ثَلاَثِيْنَ صَبَاحًا.

'পৃথিবীতে হদ্দ কার্যকর করা পৃথিবীবাসীর জন্য তিরিশ দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার চাইতে উত্তম।' অপর বর্ণনায় চল্লিশ দিনের উল্লেখ আছে।[৪৫]

হদ্দ কার্যকর করতে বাধাদান নিষিদ্ধ

আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদানের পর হদ্দ কার্যকর করতে গড়িমসি করা, তা কার্যকর করতে বাধাদান বা স্থগিতের সুপারিশ করা নিষিদ্ধ। সুপারিশের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স. চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মাখযূম গোত্রীয় এক সম্ভ্রান্ত নারী চুরি করে ধরা পড়লে কুরাইশগণ চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। তারা রসূলুল্লাহ স.-এর একান্ত প্রিয়পাত্র যুবক উসামা ইবনে যায়েদকে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য পাঠায়। তাতে রসূলুল্লাহ স. যারপর নাই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, তোমরা কি আল্লাহ্‌ নির্ধারিত হদ্দ কার্যকর না করতে সুপারিশ করছো! অতঃপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন এবং বলেন, হে জনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীরা এজন্য বিপথগামী ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং তাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করতো। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ তার হাত কেটে দিতেন।[৪৬]

বাংলাদেশের দণ্ডবিধি

বাংলাদেশে বলবৎ দণ্ডবিধি মোতাবেক অবিবাহিত নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতিতে অনুষ্ঠিত যেনা আমলযোগ্য নয়। সধবা নারী স্বেচ্ছায় যেনায় লিপ্ত হলে তার স্বামী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেই কেবল তা দণ্ডবিধির আওতায়

www.pathagar.com

আমলযোগ্য হতে পারে।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুসলিম শাসনাধীন ভারত দখলের পূর্ব পর্যন্ত এখানে ইসলাম দণ্ডবিধি কার্যকর ছিল। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ পর্যায়ক্রমে ইসলামী দণ্ডবিধির কোন কোন ধারায় পরিবর্তন আনয়ন করে ১৮৬২ সাল নাগাদ। 'যেনা' সংক্রান্ত দণ্ডবিধিতে তারা উপরোক্তরূপ বিকৃতি সাধন করে এবং তা ভারতে কার্যকর করে। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান সরকারও ঐ বিকৃত বিধি বহাল রাখে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এখানেও তা হুবহু বহাল রাখা হয়। অবশ্য কেবল জোরপূর্বক যেনা (ধর্ষণের)-র ক্ষেত্রে এখানে বর্তমানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান প্রণীত ও বলবৎ হয়েছে।
গত সংখ্যার নিবন্ধে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইহূদী-খৃস্টানরা অন্তর থেকে আল্লাহ্‌র ভয়কে বিতাড়িত করে যেরূপ নির্মম-নির্ভিকভাবে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতের (বাইবেল) বিধান বিকৃত (তাহ্‌রীফ) করেছে, তদ্রূপ আল-কুরআনের বিধানকেও তারা বিকৃত করেছে বেপরোয়াভাবে। ভারতের একাংশে শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে আসার পরও আমাদের দণ্ডবিধিতে কুরআন-ও সুন্নাহ্‌র মূল বিধান প্রতিস্থাপিত না করে বরং সেই বিকৃত বিধানকেই বহাল রাখা হয়েছে। ইসলাম মানব বংশধারাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার স্বার্থেই যেনাকে চরম ঘৃণ্য অপরাধ এবং এর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, সেই ভাবধারা বাংলাদেশে বলবৎ দণ্ডবিধিতে মারাত্মকভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।
একজন যুবক একজন যুবতীকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে কেন তাকে ধর্ষণ করছে, অতঃপর নির্মমভাবে হত্যা করছে, পাষণ্ডরূপে এসিড নিক্ষেপ করে তার সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্ট (সূরা ৯৫ : ৪ আয়াত দ্র.) দেহটাকে ঝলসিয়ে দিচ্ছে, তার কারণ খুঁজে দেখা হচ্ছে না, শুধু কঠোর শাস্তির আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রয়োগও হচ্ছে, কিন্তু অপরাধের মাত্রা কতটুকু কমেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে না।
অতএব এ বিষয়ে আমাদেরকে রসূলুল্লাহ স.-এর নীতি-দর্শন অনুসরণ করতে হবে অবশ্যই। তিনি আইন জারীর পূর্বে তা অনুসরণ করার মত সমাজের মন-মানসিকতা তৈরি করেছেন, অপরাধে উস্কানি দেয়ার বা প্ররোচিত করার মত উপায়-উপকরণ যথাসম্ভব দূরীভূত করেছেন, নিয়ন্ত্রিত করেছেন। আইনের প্রতি কীরূপ গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত থাকলে একটি মানুষ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ করেও স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে বিচারকের সামনে উপস্থিত হয়ে বলতে পারে, আমি গুরুতর অপরাধ করেছি, আমার উপর শাস্তি কার্যকর করুন।

তথ্য নির্দেশিকা

১. সূরা বানী ইসরাঈল, ৩২ নং আয়াত।

www.pathagar.com

২. সূরা আল-মু'মিনূন, ৫-৬ নং আয়াত।
৩. সূরা আল-ফুরকান, ৬৩-৬৮ নং আয়াত।
৪. সূরা আন-নূর, ৩০-৩১ নং আয়াত।
৫. সূরা আন-নূর, ২৭-২৮ নং আয়াত।
৬. সূরা আন-নূর, ৩২ নং আয়াত ও সূরা নিসা ২৫ নং আয়াত দ্র.।
৭. সহীহ বুখারী, কিতাবুস-সাওম, বাব ১০, নং ১৯০৫; নিকাহ, বাব ২, নং ৫০৬০; সহীহ মুসলিম, নিকাহ, বাব ১, নং ৩৩৯৮/১ ও ৩৪০০/৩; সুনান আন-নাসাঈ, সাওম, বাব ৪৩, নং ২২৪১-২২৪৪; সুনান ইবনে মাজা, নিকাহ, বাব ১, নং ১৮৪৫; সুনান আদ-দারিমী, নিকাহ, বাব ২, নং ২১৬৫ ও ২১৬৬; সুনান আবূ দাউদ, নিকাহ, বাব ১, নং ২০৪৬; জামে' আত-তিরমিযী, নিকাহ, বাব ১, নং ১০৮১।
৮. ফাতাওয়া আলামগীরী, ২খ., পৃ. ১৪৩, ৩য় সং., বৈরূত ১৪০০ হি./১৯৮০ খৃ.; বাদাইউস-সানাই', ৭খ., পৃ. ৩৩-৩৪, ২য় সং., বৈরূত ১৪০২/১৯৮২; শারহু ফাতহিল কাদীর, ৫খ., পৃ. ৩০-৩১, বৈরূত সং., তা.বি.।
৯. বাদাইউস সানাই', ৭খ., পৃ. ৩৩; আল-হিদায়া, ৪খ., পৃ. ৪৮৬, কুতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ, ভারত তা.বি.; তাবঈদুল হাকাইক ফী শারহি কানযিদ দাকাইক, ১ম সং., বূলাক ১৩১৫ হি. এবং মুলতান (পাকিস্তান) সং., ৩খ., পৃ. ১৬৩।
১০. সূরা নিসা, ১৫ নং আয়াত।
১১. সূরা নূর, ৪ নং আয়াত।
১২. সূরা নূর ১৩ নং আয়াত।
১৩. আবূ দাউদ, দিয়াত, বাব ১২, নং ৪৫৩৩; মুসলিম, লিআন, নং ৩৭৬২/১৫
১৪. সহীহ মুসলিম, হুদূদ, বাব ৪, নং ৪৪২৪/১৭, ৪৪২৭/১৯, ৪৪৩১/২২, ৪৪৩২/২৩; আবূ দাউদ, হুদূদ, বাব ২৩, নং ৪৪১৯; তিরমিযী, হুদূদ, বাব ৫, নং ১৪২৮; ইবনে মাজা, হুদূদ, বাব ৯, নং ২৫৫৪; দারিমী, হুদূদ, বাব ১২, নং ২৩১৫।
১৫. আবূ দাউদ, ঐ, নং ৪৪১৯; আল-হিদায়া, কিতাবুল হুদূদ, ২খ., পৃ. ৪৪৮।
১৬. উপরোক্ত বরাত দ্র.।
১৭. কিতাবুল-ফিক্হ আলাল-মাযাহিবিল আরবাআহ, ৫খ., পৃ. ৯৪, বৈরূত।
১৮. আবূ দাউদ, কিতাবুল হুদূদ, বাব ২৩, নং ৪৪৩৭।
১৯. মুসলিম, হুদূদ, নং ৪৪৩৫/২৫; আবূ দাউদ, হুদূদ, বাব ২৪, নং ৪৪৪৫, তিরমিযী, হুদূদ, বাব ৮, নং ১৪৩৩।
২০. ইবনে মাজা, কিতাবুল হুদূদ, বাব দাফইল হুদূদ বিশ-শুবুহাত, নং ২৫৪৫।
২১. পূর্বোক্ত বরাত দ্র.। উভয়টিই মহানবী স.-এর বাণী।
২২. তিরমিযী, হুদূদ, বাব ২, নং ১৪২৪।

www.pathagar.com

২৩.আবূ দাউদ, হুদূদ, বাব ৬, নং ৪৩৭৬, নাসাঈ, কাতউস সারিক, বাব ৫, নং ৪৮৮৯-৯০।

২৪. সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদূদ, বাব ২৭, নং ২০২৩।

২৫. তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর-এর ভূমিকা থেকে গৃহীত।

২৬. সূরা আন-নূর, ৩৩ নং আয়াত।

২৭. আবূ দাউদ, হুদূদ, বাব ৮, নং ৪৩৭৯; তিরমিযী, হুদূদ, বাব ২২, নং ১৪৫৪।

২৮. ফাতাওয়া আলামগীরী, কিতাবুল হুদূদ, বাব ৪, ২খ., পৃ. ১৪৮।

২৯. সূরা আল-বাকারা, ২২৯-২৩০ নং আয়াত দেখুন।

৩০. দ্র. সূরা নূর, আয়াত নং ৪।

৩১. বিশেষ শপথের জন্য সূরা নূর, ৬-৯ নং আয়াত দ্র.।

৩২. ফিক্‌হ-এর গ্রন্থাবলীতে 'লি'আন' অনুচ্ছেদে বিস্তারিত দ্র.।

৩৩. সূরা আন-নূর, ২ নং আয়াত।

৩৪. মুসলিম, হুদূদ, বাব ৩, নং ৪৪১৪/১২-৪৪১৭/১৪; আবূ দাউদ, হুদূদ, বাব ২৩, নং ৪৪১৫; তিরমিযী, হুদূদ, বাব ৮, নং ১৪৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৭, নং ২৫৫০; দারিমী, ঐ, বাব ১৯, নং ২৩২৭।

৩৫. উপরোক্ত বরাত দ্র.।

৩৬. বরাত ইতিপূর্বে উক্ত হয়েছে।

৩৭. সূরা আন-নূর, ৪ নং আয়াত।

৩৮. আবূ দাউদ, কিতাবুল হুদূদ, বাব ৩৪, নং ৪৪৭৪; আরো দ্র. নং ৪৪৭৫।

৩৯. বুখারী, কিতাবুল হুদূদ, বাব ৫, নং ৬৮৮০।

৪০. উপরোক্ত বরাত, নং ৬৮৮১, আরো দ্র. নং ৬৭৭৭।

৪১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদূদ, বাব ২৪, নং ৪৪৩১।

৪২. আবূ দাউদ, হুদূদ, বাব ৩২, নং ৪৪৪২।

৪৩. সহীহ মুসলিম, হুদূদ, বাব ২৪, নং ৪৪৩৩/২৪।

৪৪. আবূ দাউদ, হুদূদ, বাব ২২, নং ৪৪২৮; ৪৪৩৫ নং হাদীস ও দ্র.।

৪৫. সুনান আন-নাসাঈ, কিতাবুল-সারিক, বাব ৭, নং ৪৯০৮-৯; ইবনে মাজা, হুদূদ বাব ৩, নং ২৫৩৮; মুসনাদ আহমাদ, ২খ., পৃ. ৩৬২, নং ৮৭২৩, পৃ. ৪০২, নং ৯২১৫।

৪৬. বুখারী, হুদূদ, বাব ১২, নং ৬৭৮৮, আরো দ্র. নং ২৬৪৮; মুসলিম, ঐ, বাব ২, নং ৪৪১০/৮ ও ৪৪১১/৯; আবূ দাউদ, ঐ, বাব ৪, নং ৪৩৭৩; তিরমিযী, ঐ, বাব ৬, নং ১৪৩০; নাসাঈ, কাতউস-সারিক, বাব ৫, নং ৪৯০১; ইবনে মাজা, হুদূদ, বাব ৬, নং ২৫৪৮; দারিমী, ঐ, বাব ৫, নং ২৩০২।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৮, পৃষ্ঠা ঃ ৯৩-১০০

জন্ম নিবন্ধনের আইনগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপট : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

নাহিদ ফেরদৌসী

জন্ম নিবন্ধন প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সমাজের অন্যান্য নাগরিকের সাথে বিশেষত শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জন্ম নিবন্ধন সনদ অত্যন্ত প্রয়োজন। জন্ম নিবন্ধন যে কোন ব্যক্তির জন্মগত অধিকার এবং তার নাগরিকত্ব নিশ্চিত করার প্রথম ও প্রধানতম আইনি পদক্ষেপ। এটি সমাজের নাগরিক হিসেবে সরকারের কাছে তার আইনগত স্বীকৃতি।[১] কিন্তু বাংলাদেশে জন্ম নিবন্ধনের আইনগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বাধীনতা লাভ করার পরও বাংলাদেশে বৃটিশ ভারতের ৯৮ বছরের পুরানো ১৮৭৩ সালের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন আইনটি প্রচলিত ছিল। ২০০৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এই সময়ে আইনটির বাস্তবায়ন হয়নি। জন্ম নিবন্ধনের বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কাজ হিসেবেও বিবেচিত হয়নি, আবার সামাজিক প্রয়োজন হিসেবেও গুরুত্ব পায়নি।[২] ফলে শিশুসহ সকল নাগরিক তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং বিভিন্ন মামলায় বয়স সংক্রান্ত প্রমাণের অভাবে ন্যায়বিচারও ব্যাহত হয়েছে। বিশেষ করে জন্ম নিবন্ধন ছাড়া শিশু শ্রম, বাল্য বিয়ে, শিশু পাচারসহ শিশু কিশোরদের বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অসম্ভব। এসব ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা নেয়ার পরও শুধুমাত্র জন্ম নিবন্ধন সনদ না থাকায় চ্যালেঞ্জ করার কোন উপায় থাকে না। এসকল সমস্যার সমাধান ও নাগরিক সকল অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশে ২০০৪ সালে জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত নতুন আইন 'জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪' পাস করা হয়। একইসাথে ১৮৭৩ সালের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন আইন বাতিল করা হয়।[৩] তবে ২০০৪ সালে আইনটি পাস হলেও ২০০৬ সালের ৩রা জুলাই থেকে তা কার্যকর হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের জুলাই এ জন্ম নিবন্ধন আইনটি সংশোধিত হয়। বর্তমানে এই আইনটি দেশে বলবৎ আছে।

নতুন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন অনুযায়ী প্রতিটি শিশু, সে বাংলাদেশে বা দেশের বাইরে জন্মগ্রহণ করুক না কেন তাকে এই আইন অনুযায়ী শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন করতে হবে।[৪] এই আইনটির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে দেশে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধান মোতাবেক কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

www.pathagar.com

নিবন্ধন করতে হবে। এক্ষেত্রে এই আইনটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।[৫] কারণ এই আইন অনুযায়ী প্রদত্ত জন্ম সনদ বয়স প্রমাণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, বিবাহ নিবন্ধন ও সম্পত্তি হস্তান্তর করাসহ শিশু অধিকার বাস্তবায়নের একমাত্র প্রমাণপত্র হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, জমি রেজিষ্ট্রেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাংক ঋণ গ্রহণ, পাসপোর্ট পাওয়া এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীর ক্ষেত্রেও বয়স প্রমাণের জন্য জন্ম সনদ ব্যবহার করতে হবে।[৬] এ কারণে এই নতুন আইনে বিদেশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত বা সে ধরনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা নিবন্ধক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।[৭] পাশাপাশি দেশে জন্ম নিবন্ধন বাড়ানো ও প্রতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্দেশে এই আইনে দায়িত্ব বহনকারী ব্যক্তি বিশেষ করে নিবন্ধনকারী স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা, পিতামাতা, অভিভাবক, মেডিক্যাল অফিসার, জেল সুপার, কমিশনার, পরিবার কল্যাণ কর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে।[৮]

সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ২০০৫ সাল থেকে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম সফল করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আইনের গুরুত্বের তুলনায় জন্ম নিবন্ধনের চাহিদা অনেক কম। শিক্ষা বা চাকুরীক্ষেত্রে বা যারা বিদেশ যেতে ইচ্ছুক এসব কিছু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কেবল এই সনদ গুরুত্ব পায়। এই সনদের ব্যবহারিক সুফল বা সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে তৈরী হয়নি। অথচ আইনে বলা হলেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, ব্যাংক ঋণ গ্রহণে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণে, ওয়েলফেয়ার বেনিফিট গ্রহণে এই সনদের ব্যবহার করা হয় না। তাই অনেকে জন্ম নিবন্ধন করলেও সনদ ব্যবহার করতে পারছেন না। অন্যদিকে শুধুমাত্র জন্ম নিবন্ধনের অভাবে দেশে প্রচলিত অনেক আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। এমনকি শিশু জন্মহার নির্ধারণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং শিশুরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই প্রবন্ধটিতে জন্মনিবন্ধনের আইনগত বিশ্লেষণ করে নিবন্ধন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্ক আলোকপাত করা হয়েছে।

জন্ম নিবন্ধন ও জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র ঃ আইনগত রূপ

জন্ম নিবন্ধন আইন অনুযায়ী কোন নবজাত শিশুর জন্মের সাথে সাথে তার একটি নাম ঠিক করে জন্মের তারিখ, স্থান, লিঙ্গ, জাতীয়তা এবং পিতা মাতার নাম ঠিকানা, সরকারী জন্ম নিবন্ধক কর্তৃক রেজিষ্টার বইতে লিপিবদ্ধ করা হলো জন্ম নিবন্ধন।

জন্ম নিবন্ধন সনদ বলতে শিশুর নাম পিতা-মাতার নাম, ঠিকানা ও জন্ম তথ্য সম্বলিত একটি দলিল বোঝায়। আইনে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে নিবন্ধক নির্ধারিত ফি ও পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তির জন্ম সনদ প্রদান করবেন।[৯] প্রত্যেক মানুষের জন্ম সনদ ভালোভাবে সংরক্ষণ করা দরকার। কারণ সারা জীবন বিভিন্ন কাজে এটি প্রয়োজন হয়।

www.pathagar.com

জন্ম নিবন্ধনের ফলশ্রুতি

জন্ম নিবন্ধন শুধুমাত্র শিশুর সুরক্ষা নয়, এটি প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন। সব বয়সী মানুষকেই জন্ম নিবন্ধন করতে হবে। জন্ম নিবন্ধনের ফলশ্রুতিতে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে ঃ

১. **জন্ম নিবন্ধন শিশুকে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় ঃ** জন্মের সাথে সাথে শিশুর জন্ম নিবন্ধন হওয়া মানে সে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত একজন নাগরিক। এটি শিশুর অস্তিত্বের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং দাপ্তরিক রেকর্ড।

২. **নাগরিকত্ব বা জাতীয়তার অধিকার নিশ্চিত করে ঃ** জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে শিশু পিতা মাতা ও বাসস্থানের পরিচয় জানতে পারে। শিশুসহ প্রতিটি ব্যক্তির নাগরিকত্ব ও জাতীয়তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়।

৩. **রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে ঃ** যেহেতু বয়স নির্ধারনের সর্বোত্তম পথ হচ্ছে জন্ম নিবন্ধন। তাই সকল নাগরিক রাষ্ট্রপ্রদত্ত সব ধরনের মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে। যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ, পাসপোর্ট পাওয়া, ব্যাংক ঋণ গ্রহণের সুযোগ, চাকুরীগ্রহণ এবং অবসরের পূর্বে বয়স নিশ্চিত হওয়ার সুবিধাসহ অন্যান্য সকল অধিকার ভোগ করতে পারবে।

৪. **মানবাধিকার বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে ঃ** জন্ম নিবন্ধন সকল নাগরিকের মানবাধিকার অর্জনে সহায়তা করে। মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখে। সামাজিক সুরক্ষা, সেবা যত্ন-পরিচর্যা, পিতামাতার কাছে ভরণপোষনের আইনগত অধিকার দাবী করতে পারে এবং উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারও অর্জন করে।

৫. **জন্ম নিবন্ধন সনদ দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইন ও বিবিধ বাস্তবায়ন সহজ করেঃ** যেহেতু জন্মনিবন্ধন সনদ দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইন ও বিধি বাস্তবায়ন সহজ করে এবং যেহেতু জন্মনিবন্ধন ব্যক্তির সঠিক বয়সের একমাত্র প্রমাণপত্র তাই যে কোন মামলায় বয়স সংক্রান্ত বিষয়ে জন্ম নিবন্ধন সনদ থাকলে প্রচলিত অন্য আইন ও বিধিসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। যেমন অন্যায় কাজে জড়িত শিশু কিশোরদের সঠিক বয়স জানা থাকলে কিশোর অপরাধী সনাক্ত করনে সুবিধা হয়। শিশু শ্রম এবং অল্প বয়সে বিয়ে রোধ করতে জন্মনিবন্ধনের বিকল্প নেই, বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের। এছাড়া যদি সবার জন্ম নিবন্ধন সনদ থাকে তবে পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুদের নাগরিকত্ব নির্ধারন করে দেশে ফিরিয়ে আনা সহজ হয়। পুলিশের মামলা নথিভুক্ত করতে এবং এফিডেফিট করা সহজ হয়।

৬. **দেশের জনমিত্তিক বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সুবিধা হয় ঃ** জন্ম নিবন্ধনের ফলে দেশের জনসংখ্যা জন্মহার মৃত্যু হার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার

www.pathagar.com

প্রভৃতি জনমিত্তিক উপাত্ত পাওয়া সম্ভব হবে এবং সুষ্ঠুভাবে বয়স্কভাতা প্রদান নিশ্চিত করা যাবে।

জন্ম নিবন্ধন আইনের পূর্বকথা

সর্ব প্রথম ১৮৭৩ সালে বৃটিশ ভারতে জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন আইন প্রণীত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এই আইনটিই প্রচলিত থাকে। এটিই ছিল জন্ম নিবন্ধন সম্পর্কিত মূল আইন। এই আইন অনুযায়ী জন্মের ৮ দিনের মধ্যেই শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক ছিল। গ্রাম এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ, শহর এলাকায় পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জন্ম নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।[১০] এরপর ১৯৫৯ সালে শিশুর জন্মের সংবাদ ইউনিয়ন কাউন্সিল সেক্রেটারীর কাছে পৌছানোর জন্য গ্রাম্য চৌকিদারকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া বেঙ্গল মিউনিসিপাল এ্যাক্ট ১৯৩২ এবং মিউনিসিপাল অর্ডিন্যান্স ১৯৬০ অনুযায়ী শহর এলাকার ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম সংবাদ পৌরসভার রেজিস্ট্রারকে পৌছানোর দায়িত্ব পরিবারের সদস্য, হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলোকে দেয়া হয়।

পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে ১৮৭৩ সালের জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন আইনের একটি নতুন অর্ডিন্যান্স জারী করা হয় এবং গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে কর্মী নিয়োগ করা হয় যারা এ কাজের জন্য রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।[১১] তখন থেকেই জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনাগুলো নিয়মিত রেজিস্ট্রি করার বিধান করা হয়। এভাবে জন্ম নিবন্ধন আইন সংশোধিত ও পরিমার্জিত হতে থাকে। এরপর ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে বলা হয় যে জন্ম মৃত্যু, অন্ধত্ব, ভিক্ষুক এবং বিপদগ্রস্তদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য গ্রাম্য পুলিশ রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করবে এবং ইউনিয়ন পরিষদকে জানাবে এবং রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব থাকবে চেয়ারম্যানের উপর। এছাড়া মিউনিসিপাল অর্ডিন্যান্স ১৯৯৭ (সংশোধিত) অনুযায়ী পৌর এলাকায় জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে রেজিস্ট্রেশন ও প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট পৌর কর্তৃপক্ষ প্রদান করবে। অবশেষে ২০০৪ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন পাস করা হয় যা ২০০৭ সালে সংশোধন করা হয়। এটাই জন্ম নিবন্ধন সম্পর্কে প্রচলিত মূল আইন।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ

(১) জন্মের সাথে সাথেই শিশুর জন্ম নিবন্ধীকরণ করতে হবে এবং জন্ম থেকেই তার নামকরণ লাভের, একটি জাতীয়তা সনদ অর্জনের এবং যতটা সম্ভব পিতা-মাতার পরিচয় জানার ও তাদের কাছে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার থাকবে।

(২) এই সনদে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইন অনুসারে এই অধিকার সমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে এবং এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের বাধ্যবাধকতা মেনে চলবে; বিশেষ করে সে সব ক্ষেত্রে যেখানে এর অন্যথা হলে শিশু রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে।[১২] এভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জন্ম নিবন্ধনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা আছে।

www.pathagar.com

সামাজিক বাস্তবতা ও প্রস্তাব

বাংলাদেশে ২০০৬ সাল থেকে জন্ম নিবন্ধনের নতুন আইনটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ হচ্ছে। ইতোমধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'জন্ম নিবন্ধন পুরস্কার' ঘোষণা দিয়েছে; যাতে জন্ম নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়।[১৩] সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে সমানভাবে জন্ম নিবন্ধন আইন বাস্তবায়নের উপলব্ধি তৈরি করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাই প্রতিবছর ৩রা জুলাই জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস পালন করা হয়। এই দিনটিতে নতুন করে ঘোষণা দেয়া হয় যে, জন্ম নিবন্ধন শিশুর মৌলিক অধিকারসমূহকে নিশ্চিত করে। এই বাৎসরিক কর্মসূচীটি যৌথভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউনিসেফ এবং অন্যান্য সংস্থা পালন করে থাকে।[১৪]

কিন্তু বাংলাদেশে শিশু জন্ম নিবন্ধন হলেও অন্যান্য নাগরিকের জন্ম নিবন্ধনকরণের হার লক্ষ্যের থেকে অনেক কম। অথচ জন্ম নিবন্ধন সব বয়সী মানুষের জন্য সমান গুরুত্ব বহন করে। শিশু জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ইউনিসেফের এক জরিপে দেখা গেছে, প্রতিবছর ৩৭ লাখ শিশু জন্মগ্রহণ করে কিন্তু গড়ে ৭.৫ শতাংশের মতো শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা হয়।[১৫] ২০০৫ সালে জাতীয় শিশু জন্ম নিরবন্ধন কনফারেন্স-এর তথ্য মতে বাংলাদেশে মাত্র ১০ শতাংশ শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে।[১৬] অন্যদিকে ইউনিসেফের 'মাল্টিপল ইনডিকেটরস ক্লাস্টার সার্ভে ২০০৬' অনুযায়ী সারাদেশে জন্ম নিবন্ধনের হার প্রায় ১০ শতাংশ। উল্লিখিত তথ্যমতে ২০০৫ এবং ২০০৬ সালে বাংলাদেশে জন্ম নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়নি।[১৭] তবে স্থানীয় সরকারের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ডিসেম্বর ২০০৬-এ বলা হয়েছে-দেশের মাত্র দেড় কোটি মানুষ জন্ম নিবন্ধন করেছে।[১৮] দেশের সর্বমোট জনসংখ্যার তুলনায় এটি অত্যন্ত কম। যদিও শুধুমাত্র শিশু নয় সকল বয়সী মানুষের জন্ম নিবন্ধনের হিসাব দেয়া হয়েছে এ তথ্যে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ সরকার সব বয়সী মানুষদের জন্ম নিবন্ধনের আওতায় আনার লক্ষ্যে 'সার্বজনীন জন্ম নিবন্ধন কৌশল' গ্রহণ করেছিল যেখানে ২০০৬ সাল থেকে জুলাই ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধন করার সুযোগ রাখা হয়।[১৯] শুধুমাত্র জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এই ধরনের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। এছাড়া ২০০৭ সালে সরকারীভাবে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন পদ্ধতি প্রচলন করা হয়। এতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাঠকর্মীগণের মাধ্যমে জন্ম তথ্য সংগ্রহ করে সেটি ইউনিয়ন বা পৌরসভায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এই নিবন্ধন কর্মসূচীর আওতায় সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। এভাবে ২০০৭ সালে জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত সচেতনতার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ফরম নিবন্ধন রেজিস্টার ও মনিটরিং ফরমেটও করা হয়। ইউনিসেফের এক তথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র ২০০৭ সালের শেষের দিকে ১৭টি জেলার বিভিন্ন পৌরসভা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশনে ৫ লাখ শিশুর (যাদের বয়স ৫ বছরের নীচে) জন্ম নিবন্ধিত হয়।[২০]

www.pathagar.com

আইনে জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হলেও সামাজিক সচেতনতার অভাব ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সীমাবদ্ধতার কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে এর চাহিদার তারতম্য দেখা যায়। সরকারী এবং ইউনিসেফের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০০৫ এবং ২০০৬ সালে দেশে জন্ম নিবন্ধনের হার ৮ থেকে ১০ শতাংশের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ২০০৭ ও ২০০৮ সালে সরকার, ইউনিফে এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে জনগণের মাঝে জন্ম নিবন্ধনের সচেতনতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি করে। এসব কারণে ২০০৭-২০০৮ সালে জন্ম নিবন্ধনের হার ২৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।[২১] তবে এখনও আমাদের দেশে জন্ম নিবন্ধন পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। বিভিন্ন কারণে স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং সিটি করপোরেশনগুলো তাদের জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম ফলপ্রসূ করতে পারছে না। যেমনঃ

১. জনগণের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনের গুরুত্ব উপলব্ধির অভাব রয়েছে।

২. অনেক সময় জন্ম নিবন্ধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা সমূহের আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং দক্ষ জনবলের অভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে জন্ম নিবন্ধন করতে পারে না।

৩. জন্ম নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধককে অবহিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে সচেতন করার কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সদিচ্ছার অভাব দেখা দিলে জন্ম নিবন্ধন বাস্তবায়ন করা যায় না। আইনে জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক এবং কেউ জন্ম নিবন্ধনের জন্য তথ্য না দিলে কিংবা ভুল তথ্য দিলে তার সাজা হবে। এছাড়াও রেজিস্ট্রার কোনো মানুষের জন্ম নিবন্ধন না করলেও তার সাজা হবে। জন্ম নিবন্ধন আইন না মানলে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে এবং ২ মাস জেল অথবা উভয়ই দণ্ড ভোগ করতে হবে।[২২] এমনকি এই আইনের অধীনে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অথবা নিবন্ধক ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবে।[২৩] কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের কোন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় না।

কতিপয় প্রস্তাব

জন্ম নিবন্ধন সনদের গুরুত্ব প্রতিটি নাগরিকের কাছে সমান হওয়া জরুরী। জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমের গতিশীলতার লক্ষ্যে নিম্নে কিছু প্রস্তাব দেয়া হল–

১. জন্ম নিবন্ধনের সুফল সম্পর্কে অব্যাহত প্রচারনা চালানো

জন্ম নিবন্ধন আইন ও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যেমন রেডিও, টেলিভিশন, দৈনিক পত্রিকা স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচিত্রের মাধ্যমে অব্যাহত প্রচারনা চালাতে হবে তেমনি স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষায় নিবন্ধনের পক্ষে প্রচার কার্য করতে হবে। তবেই সাধারণ মানুষের মনে জন্ম নিবন্ধনের স্বপক্ষে উপলব্ধি তৈরী হবে।

২. নিকটস্থ ব্যক্তির সদিচ্ছা ও উদ্যোগ গ্রহণ

শিশুর পিতা-মাতা, ডাক্তার, নার্স, পরিবার পরিকল্পনা কর্মীগণকে শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত

www.pathagar.com

করার জন্য আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অন্যদেরকেও এ বিষয়ে উৎসাহ যোগাতে হবে।

৩. জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদর্শনের বাধ্য বাধকতা

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা, চাকুরীতে নিয়োগ, নাগরিকত্ব নির্ধারন, বিয়ে রেজিস্ট্রি পাসপোর্টের জন্য, ব্যাংক একাউন্টের আবেদনের ক্ষেত্রে, করদাতার নম্বর পাওয়ার জন্য, আমদানি ও রফতানি অনুমোদন পাওয়ার জন্য, গাড়ী রেজিস্ট্রি বা লাইসেন্স পাওয়ার জন্য, বাড়ি বা ভবন নকশার জন্য এবং বিদ্যুৎ গ্যাস, পানি, টেলিফোন সংযোগের অনুমতি পাওয়ার জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে এবং সনদ ছাড়া অযোগ্যতা বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এই সনদের ব্যবহারিক সুফল ভোগের জন্য জন্ম নিবন্ধন বৃদ্ধি পাবে।

উপসংহার

জন্মগ্রহণের পর যে অধিকার একটি শিশু অর্জনের দাবী রাখে তা হচ্ছে জন্ম নিবন্ধন। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জন্ম নিবন্ধন হচ্ছে বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরিবারের শিশুদের স্থায়ী পারিবারিক পরিচিতি। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে তাদের স্থায়ী আশ্রয় হারাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে জন্ম নিবন্ধন না হওয়ার কারণে তারা আরও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। তাই সকল নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদ নেয়া প্রয়োজন। এই সনদ মূলত একজন নাগরিকের জাতীয়তার দলিল। তাই সকল নাগরিককে সচেতনতার সাথে জন্ম নিবন্ধন কর্মসূচী সফল করতে হবে।

সংযুক্তি

জন্ম নিবন্ধন একটি প্রশাসনিক কল্যাণমূলক উদ্যোগ। যার বহুবিধ সুফল, উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এ প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়টিকে ইসলামী শরীয়া আইনের আলোকে বিচার করলেও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। কুরআন ও সুন্নাহ তথা ইসলামের মৌল বিষয়ের পরিপন্থী নয় এমন যে কোন প্রশাসনিক বিধান ইসলাম সম্মত। অন্য কথায় বলা যায়, যা কল্যাণকর তাই ইসলাম।

একটি শিশুর আত্ম পরিচয় তার লালন পালন তার উত্তরাধিকার প্রাপ্তি, বিবাহশাদী ইত্যাকার ইসলামী আইনের মৌলিক বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগী হতে পারে জন্ম নিবন্ধন। তাই বলা চলে জন্ম নিবন্ধন কর্মসূচী বাস্তবায়নে মসজিদের ইমাম খতীব ও দেশের উলামায়ে কেরামদের শামিল করলে তারা সহজে মানুষকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।

তথ্যপঞ্জি

১। মমতাজ রুমী, 'জন্ম নিবন্ধন ঃ শিশুর অধিকার রক্ষায় প্রাথমিক ও প্রধানতম পদক্ষেপ' স্টেট অফ চাইল্ড রাইটস্ ইন বাংলাদেশ ২০০৬, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ), ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭।

www.pathagar.com

২। তেরেস ব্লঁশে, 'বাংলাদেশ শিশু অধিকার ঃ হারানো শৈশব, তার ইতিকথা' অনুবাদক সৈয়দ আজিজুল হক, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৪৭।

৩। স্বণ ঃ দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ জুন ২০০৭।

৪। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪, ধারা-৮।

৫। তদেব, ধারা-৩।

৬। তদেব, ধারা-১৮।

৭। তদেব, ধারা-৪ (ঙ)।

৮। তদেব, ধারা-৯।

৯। তদেব, ধারা-১০।

১০। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন আইন, ১৮৭৩।

১১। তেরেস ব্লঁশে, 'বাংলাদেশে শিশু অধিকার ঃ হারানো শৈশব, তার ইতিকথা', পৃষ্ঠা-৪৭।

১২। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, অনুচ্ছেদ ৭(১)(২)।

১৩। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় রিপোর্ট, ২০০৭।

১৪। স্যামসাম রহমান, 'মানবাধিকার বাস্তবায়নে জন্ম নিবন্ধন' স্টেট অফ চাইল্ড রাইটস্ ইন বাংলাদেশ, ২০০৭। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯৩।

১৫। ইউনিসেফ রিপোর্ট, ২০০৭।

১৭। জাতীয় শিশু নিবন্ধন কনফারেন্স, ২৭ অক্টোবর, ২০০৫, স্থান-ঢাকা।

১৭। দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ জুন ২০০৭।

১৮। 'পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন' ডিসেম্বর ২০০৬।

১৯। Universal Birth Registration Strategy, 2006, The Government of Bangladesh.

২০। ইউনিসেফ রিপোর্ট, ২০০৭।

২১। স্যামসাম রহমান, 'মানবাধিকার বাস্তবায়নে জন্ম নিবন্ধন' পৃষ্ঠা-৯৪।

২২। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪, ধারা-২১।

২৩। তদেব, ধারা-২২।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৮, পৃষ্ঠা ঃ ১০১-১২২

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস

মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ

ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান

॥ তিন ॥

হযরত হূদ আ. তার নিজ জাতি আদ-এর প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। আদ হযরত নূহ আ.-এর ৫ম পুরুষের মধ্যে এবং তাঁর পুত্র সাম-এর বংশধরের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম। পরবর্তী পর্যায়ে আদ নামক ব্যক্তির বংশধর ও গোটা জাতি 'আদ নামে খ্যাত হয়। 'আদ জাতির লোকেরা ছিল সুঠামদেহী ও দীর্ঘ আকৃতি বিশিষ্ট। তারা প্রচন্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিল। এছাড়া আর্থিক দিক হতেও তারা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। 'আদ জাতি তাদের সুখ সমৃদ্ধি ও শক্তিমত্তায় গর্বিত হয়ে বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা দুনিয়ার শান শওকতে মত্ত হয়ে পাপাচারে আকণ্ঠ ডুব দেয়। খাদ্য গ্রহণ ও যৌন সম্ভোগই তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে তারা তাদের পূর্ববর্তী নবীদের শিখানো হেদায়েত ভুলে যায় ও আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। তাদের সমাজ জীবন আর পশুদের বন্য জীবন একই ধারায় এগিয়ে চলে। ফলে তাদের মধ্যে চরম অশান্তি ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ হযরত হূদ আ.-কে তাদের মাঝে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। পবিত্র কুরআনে হযরত হূদ আ. সম্পর্কে অনেক আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত নূহ আ.-এর মহা প্লাবনের ধ্বংস থেকে বেঁচে যাওয়া লোকদের মাঝে নবীদের হেদায়েত আল্লাহর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কার্যকর ছিল। পরবর্তী সময়ে 'আদ জাতির লোকেরা তাদের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ প্রতিপত্তির মোহে এক আল্লাহর বিধান ভুলে গিয়ে শিরকে লিপ্ত হয়। তারা চরম নাফরমানীতে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে হেদায়েতের জন্য হূদ আ.-কে পাঠানোর কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করে বলেন ঃ

লেখক ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

www.pathagar.com

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا
تَتَّقُوْنَ. قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا
لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ. قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ
رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ
جَاۤءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ
خُلَفَاۤءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوْا اٰلَاۤءَ اللّٰهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ
اٰبَاۤؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ
رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْ اَسْمَاۤءٍ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ
مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ.
فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

'আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হূদ-কে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না? তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরীতে লিপ্ত ছিল তারা বললো, আমরা তো দেখছি তুমি একটা নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি। সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, বরং আমি মহাবিশ্বের প্রতিপালকের রসূল। আমি আমার রবের বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমাদের নিকট তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য বিধান এসেছে? এবং একথা স্মরণ কর যে, তোমাদেরকে আল্লাহ নূহের জাতির পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী করে সৃষ্টি করেছেন সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর হয়ত তোমরা সফলকাম হবে।
তারা বললো, তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্যই এসেছ যে, আমরা যেন এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যাদের ইবাদত করতো তা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী বলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে

www.pathagar.com

এসো। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে; তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? তা এমন কতগুলো নাম সম্পর্কে যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ সৃষ্টি করেছে এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠাননি? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি ও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। অতঃপর নবীকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করলাম। আর আমার নিদর্শনকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং যারা মুমিন ছিল না তাদেরকে নির্মূল করলাম। (সূরা আ'রাফ ঃ ৬৫-৭২)

আল্লাহর বিধি বিধানকে বাস্তব জীবনে কার্যকর করার এবং তা মেনে নেয়ার জন্য হযরত হূদ আ.-এর দাওয়াতী তৎপরতা বর্ণনা করে সূরা হূদে বলেন, "আমি 'আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোন ইলাহ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার দাওয়াতী কাজের বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক আছে তার নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি তবুও অনুধাবন করবে না? হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে এস। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষাবেন। তিনি তোমাদেরকে আরও শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না। জবাবে তারা বললো, হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস নি। তোমার কথায় আমরা আমাদের ইলাহদেরকে পরিত্যাগ করতে পারি না এবং আমরা তোমাকে বিশ্বাসই করি না। আমরা এই বিশ্বাস নিয়েই বলি যে আমাদের ইলাহদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে। হূদ বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা আল্লাহর শরীক কর তাঁকে বাদ দিয়ে। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, অতঃপর আমাকে অবকাশ দিও না, আমি সর্বদাই আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর নির্ভর করি এমন কোন জীব-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে। অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যা নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। আমি তো তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের থেকে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এবং যখন আমার নির্দেশ আসলো তখন আমি হূদ ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করলাম। আদ জাতি

www.pathagar.com

তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর রসূলগণকে অমান্য করেছিল আর তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করতো। এ দুনিয়ায়ই তাদেরকে লা'নতগ্রস্ত করা হয়েছিল এবং কিয়ামতের দিনও তাদেরকে লা'নতগ্রস্ত করা হবে। জেনে রাখ! আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রাখ ধ্বংসই হল পরিণাম 'আদের, যপরা হূদের সম্প্রদায়।' (সূরা হূদ ঃ ৫০-৬০)

আদ জাতির সময় কাল

আদ জাতির আবির্ভাবের সময়কাল আনুমানিক ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। কেননা আদকে (عـوض بن ادم بـن سـام)-এর সন্তান বলা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে তাদেরকে নূহের জাতির প্রতিনিধি বলা হয়েছে।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوْا اٰلَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

'এবং স্মরণ কর আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে।' (সূরা আ'রাফ ঃ ৬৯)

আদ জাতির আবির্ভাব কাল ২২০০ খৃ. পূ. হতে আরম্ভ হয় বলে অনুমিত। ১৫০০ খৃ. পূ. য়ামান-এ অপর একটি শক্তিশালী জাতির উদ্ভব ঘটে এবং ঐ সময়ের কিছু পূর্বের যুগ ছিল হযরত মূসা আ.-এর যুগ। হযরত মূসা আ.-এর একজন অনুসারী মুমিন ব্যক্তি ফিরাউনের সামনে বলেছিলেন ঃ

يَا قَوْمِ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ.

হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করছি, যেমন ঘটেছিল নূহ, 'আদ, ছামুদ এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে ঃ (সূরা আল-মুমিন ঃ ৩০-৩১)

উল্লেখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে আদ জাতির আবির্ভাব কাল ৩০০০ খৃ. পূ. হলেও তাদের গৌরবময় যুগ খৃ. পূ. ২২০০ সাল হতে খৃ.পূ. ১৭০০ সাল পর্যন্ত ছিল। অবশ্য 'আদ জাতির কিছু লোক হযরত ঈসা আ.-এর যুগ পর্যন্ত ছিলেন। গ্রীক ইতিহাসে আদ عادرشيا (عَادام) এবং عَادأيت (عاد) ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা

www.pathagar.com

হয়েছে, যারা হাদরামাউত ও য়ামানের বাসিন্দা ছিল। পার্থক্য নির্ধারণের জন্য ১ম যুগকে عاداولى এবং ২য় যুগকে عادثانية বলা হয়। (সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, তারীখু আরদিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৯৮-৯৯)

আদ জাতির বাসস্থান

তারীখু আরদিল কুরআনের তথ্য মোতাবেক জানা যায় যে, 'আদ জাতির কেন্দ্রীয় আবাস ভূমি আরবের উৎকৃষ্ট বিস্তৃত অংশ অর্থাৎ 'য়ামান' ও 'হাদরা মাওত' তথা পারস্য উপসাগরের উপকূল হতে ইরাক সীমান্ত পর্যন্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাদের রাজত্বের মূল কেন্দ্র ছিল য়ামান।

(সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, তারীখু আরদিল কুরআন খ. ১, পৃ. ৯৯)।

কাসাসুল কুরআন গ্রন্থের গ্রন্থকারের মতে 'আদ জাতি হযরত নূহ আ.-এর পর পৃথিবীতে আবাদ হয়। 'আহকাফ' নামক বালুকাময় মরুভূমিতে তাদের বসতি ছিল। ঐ এলাকা হাদরামাওত ও য়ামানের উত্তরে য়ামান উপসাগরের তীরব্যাপী বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চল প্রাচীন কাল হতেই বালুকাময় ছিল, না 'আদজাতির ধ্বংসের পর বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়, তা জানা যায় না।

ইব্‌ন কাছীর তাঁর কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থে এইমত পোষণ করছেন যে 'আদ জাতি অর্থাৎ আদ ইবন আওস ইবন সাম ইবন নূহ ছিল-একটি আরবীয় জাতি গোষ্ঠী। তারা আল-আহকাফে বসবাস করত এবং আহকাফ হলো বালির পাহাড়। এটা ওমান ও হাদরামাওতের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত ছিল। এ স্থান সমুদ্র উপকূলে বিস্তৃত ছিল। উপকূল সংলগ্ন স্থানকে الشُّحْرُ। (আশ-শিহর) বলা হতো এবং ঐ স্থানের উপত্যকার নাম مُغِيْثُ (মুগীছ)। (বিদায়া ওয়ান'-নিহায়া খ. ১, পৃ. ৯৫)

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَقَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه اَلاَّ تَعْبُدُوْآ اِلاَّ اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

"স্মরণ কর 'আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যার পূর্বে ও পরেও সতর্ককারীরা এসেছিল। সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল এই বলে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর ইবাদত করো না। আমি তো তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি।" (সূরা আল-আহকাফ ঃ ২১)

সম্ভবত বর্তমান য়ামান, হাদারামাওত, ওমান, কাতার, আল আহসা ইত্যাদি স্থানে 'আদ জাতির বসতি বিস্তৃত ছিল। এদের কেন্দ্রস্থল ছিল আহকাফ, যা হাদরামাউতের উত্তরে, ওমানের পশ্চিমে এবং রুবউলখালীর দক্ষিণে অবস্থিত। বর্তমানে আহকাফে বালুর টিলা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু ঐ যুগে আহকাফ অঞ্চল সবুজ শ্যামল প্রান্তর ছিল। কেননা আল্লাহর ঘোষনা হলো ঃ

www.pathagar.com

وَاتَّقُوْا الَّذِىْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ. اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ. وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

নবী বলেন, "ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদের দিয়েছেন সেই সমুদয় বিষয় যা তোমরা জ্ঞাত। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আনআম, (অর্থাৎ উট, গরু, মেষ, ছাগল) ও সন্তান-সন্ততি, উদ্যান ও প্রস্রবন। আর আমি তোমাদের জন্য মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করছি।' (সূরা সু'আরা ঃ ১৩২-১৩৫)।

সাইয়িদ সুলায়মান নদবীর তারীখে আরদুল কুরআন গ্রন্থে بلاد الأحقاف শিরোনামে উল্লেখিত আছে যে, য়ামান, ওমান, বাহরাইন-হাদরামাওত ও পশ্চিম য়ামানের মধ্যবর্তী যে বিশাল প্রান্তর 'রুবউল-খালী' নামে পরিচিত, যদি ও তা অনাবাদী ভূমি কিন্তু এর আশ-পাশে হাদরামাওত হতে মাজরান পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে কিছু আবাদীযোগ্য ভূমি বিদ্যমান, বর্তমানে তা আবাদযোগ্য না থাকলেও প্রাচীনকালে হাদরামাওত ও নাজরানের মধ্যবর্তী অংশে "আদ-ই-ইরান'-এর বিখ্যাত জাতির বসবাস ছিল। এ জাতিকে আল্লাহ না-ফরমানীর কারণে ধ্বংস করে দেন। (সাইয়িদ সুলায়মান নদবী, তারীখু আরদিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৭৩)।

'আম্বিয়ায়ে কুরআন' নামক গ্রন্থে 'আদ জাতির আবাস ভূমির পরিচয়ে বলা হয়েছে, 'দক্ষিণ-পূর্ব আরবে পারস্য উপসাগরীয় উপকূল হতে 'ইরাক সীমান্ত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে হাদরামাওত পর্যন্ত 'আদ জাতির আবাস ভূমি বিস্তৃত ছিল।
(মুহাম্মদ জামিল আহমাদ, আম্বিয়াই কুরআন, খ. ১, পৃ. ১২৪, লাহোর পাকিস্তান)

আদ জাতির জাগতিক শক্তি ও সমৃদ্ধির ইতিহাস

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে 'আদ জাতিকে হযরত নূহ আ.-এর পরে পৃথিবীতে আগমনকারী এবং শারীরিক শক্তি, ধনসম্পদ ও মর্যাদার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বলে অভিহিত করা হয়েছে। এমনকি তাদেরকে নূহের জাতির পরে দুনিয়ার খিলাফতের দায়িত্বশীল করা হয় ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের জাতির পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিক সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সকলকাম হবে। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৬৯)

www.pathagar.com

'আদ জাতির লোকেরা বিশাল দেহী এবং প্রচন্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রা-ও হযরত মুকাতিল র.-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাদের উচ্চতা প্রায় ১২ হাত তথা ১৮ ফুট ছিল, (মুফতী শফি, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ, পৃ. ১৪৫৪)।

মানব জাতির ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, আদ জাতির মত শক্তিশালী আর কোন মানব সম্প্রদায় তৎকালীন পৃথিবীতে ছিল না। হাফেজ ইবন কাছীর বলেন, 'আদ জাতির একজন লোক বিরাট পাথর খন্ড হাতে নিয়ে শত্রু গোত্রের প্রতি নিক্ষেপ করে তাদের ধ্বংস করে দিতে পারতো।

তারা তাদের শক্তিমত্তা, ধন-সম্পদ ও শিল্প বিজ্ঞানের বিচারে সম-সাময়িক সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। তাদের শান-শওকত ও সার্বিক শক্তিমত্তা তাদেরকে অহংকারী, অত্যাচারী ও সীমা লংঘনকারী বানিয়ে দেয়। তাদের অধিকৃত এলাকায় তারা সদম্ভে বিচরণ করতো। তারা ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিসমূহের উপর অন্যায়ভাবে কঠোর আচরণ ও যুলুম চালাতো। তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল না, নিজেদের শক্তিমত্তার কারণে তারা কাউকে পরোয়া করতো না। তারা অহংকার করে বলতো, এই পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে? এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ.

"আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করতো এবং বলতো আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তবে লক্ষ করেনি যে, আল্লাহ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করত।" (সূরা ফুচ্ছিলাত ঃ ১৫)

'আদ জাতির ঔদ্ধত্য ও অবিমৃষ্যকারিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে ছিল যে, তারা তাদের উপর আপতিত আযাবের কথা বা আখিরাতের আযাবের কথা হযরত হূদ আ.-এর থেকে শ্রবণ করার পরও দম্ভ ভরে তাদের ঔদ্ধত্যও বে-পরোয়া আচরণের কথা প্রকাশ করে। পবিত্র কুরআনে এটাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

قَالُوْاۤ اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

www.pathagar.com

"তারা বলেছিলো, তুমি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীর পূজা করা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছো? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা এনে দাও"। (সূরা আল-আহকাফ ঃ ২২)

'আদ জাতির প্রতি আল্লাহর দীন মেনে নেয়ার দাওয়াত

আল্লাহ রব্বুল আলামীন দুনিয়ার মানুষের হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী রসূলদের প্রেরণ করেছেন। নূহ আ.-এর পরে হযরত হূদ আ.-কে পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী, অহংকারী যালেম, আল্লাহর নাফরমান মূর্তিপূজক 'আদ জাতির মধ্যে প্রেরণ করেন। 'আদ জাতি যখন তাদের শক্তিমত্তায় উন্মত্ত হয়ে আরব ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় লুটপাট, অসৎ কার্যকলাপ, ঝগড়া-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন হূদ আ. আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহের বর্ণনা দান পূর্বক বলেন, হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেয়ামত দিয়ে তোমাদের পূর্ণ ভরপুর করে দিয়েছেন। তোমরা সবুজও সতেজ অঞ্চলের মালিক। ধন-সম্পদ, বাগান, ঝর্ণা, গবাদি পশু মোট কথা জীবনোপকরণের সকল বিষয় করেছেন তোমাদের জন্য সহজলভ্য। কওমে নূহের পর আল্লাহ তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাই বলে তোমরা আল্লাহর যমীনে অহংকার করবে, দুর্বলের উপর যুলুম করবে, মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিবে, নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করবে, ভালোও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করবে না। তোমরা এ সব অন্যায় কেবল এ জন্য করছ যে তোমরা মনে করছ, আল্লাহর যমীনের উপর তোমাদের কারোর কাছে জবাবদেহী করতে হবে না। তোমরা যদি উপরিউক্ত সকল কার্যকলাপ এবং পাপাচার পরিত্যাগ করে তোমাদের চরিত্র সংশোধন কর, আল্লাহর নিকট পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিজেদেরকে তাঁর মুখাপেক্ষী কর, তাহলে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের শক্তিমত্তা ও সচ্ছলতায় আরও উন্নতি দান করবেন এবং তোমরা পরিত্রাণ লাভ করবে। কিন্তু তোমরা যদি নিজেদেরকে সংশোধন না কর, তাহলে স্মরণ রেখ, যে আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এসব অনুগ্রহরাজী দ্বারা ভূষিত করেছেন, তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য আর এক জাতিকে রাজত্ব দান করবেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত হূদ আ.-এর দাওয়াত ও তা'লীমের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا
وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ.

"হে আমার জাতি! তোমাদের পালন কর্তার নিকট তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে এসো। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি ধারা প্রেরণ

www.pathagar.com

করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা অপরাধীর মত বিমুখ হয়ো না।" (সূরা হূদ ঃ ৫২)

আদ জাতি তাদের বসবাসের জন্য বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করতো এবং তারা মনে করতো, তারা চিরকাল দুনিয়াতে থাকতে পারবে। তারা মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতো এবং দুর্বলের উপর যুলুম করতো। তাদের এহেন কার্যকলাপের উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوْا الَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"তোমরা প্রতিটি উচ্চ স্থানে নিরর্থক স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করছ? এবং বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করেছ, যেন তোমরা চিরকাল এই অট্টালিকায় থাকবে। যখন তোমরা আঘাত হানো, তখন যালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সে সব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি এবং উদ্যান ও ঝর্না।" (সূরা আশ-শু'আরা ঃ ১২৮-১৩৪)।

আদ জাতির মধ্যে অন্যায়-অপকর্ম এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং মূর্তি পূজা তাদের চিন্তা চেতনায় ও অস্থি-মজ্জায় এমনভাবে বাসা বেধেছিল যে, তাদের উপর হযরত হূদ আ.-এর দাওয়াতী কাজ কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তারা হযরত হূদ আ.-এর পয়গাম শ্রবণে আগ্রহী হয়নি, বরং গর্ব ও অহংকারবশত মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। পবিত্র কুরআনে তাদের বক্তব্য নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِىْ الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ.

"আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করতো এবং বলতো, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে আছে? তারা কি লক্ষ করেনি, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিধর? বস্তুত তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করতো"। (সূরা ফুচ্ছিলাত ঃ ১৫)

হযরত হূদ আ. তাঁর জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আমার সম্প্রদায়! ফেরেশতাদেরকে রসূল হিসেবে পাঠানো উচিত ছিল, এই মর্মে তোমাদের বক্তব্য তোমাদের মূর্খতারই পরিচায়ক। তোমাদের জাতির কারো উপর আল্লাহর পয়গাম

www.pathagar.com

অবতীর্ণ হওয়ায় আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। কেননা প্রথম হতেই আল্লাহর এই বিধান চলে আসছে। আল্লাহ মানব জাতির হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য তাদের মধ্য হতেই কোন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাঁর রসূল বানিয়ে প্রেরণ করেন এবং ঐ রসূলের মাধ্যমে সকল বান্দাহর নিকট তাঁর আহকাম, বিধি নিষেধ ও বিচার ফয়সালার নির্দেশাবলী পৌছানোর ব্যবস্থা করেন। যুক্তিযুক্ত নিয়ম এই যে, কোন জাতির হিদায়েতের জন্য এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত, যিনি সেই জাতিরই একজন হবেন, তাদের ভাষায় কথা বলবেন, তাদের চরিত্র-অভ্যাস এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ভালোভাবে জানেন, তাদের মতই জীবন যাপন করেন এবং জাতির প্রসিদ্ধ লোকেরা সকলেই তাকে চিনে।

হযরত হূদ আ.-এর দাওয়াতী জিহাদ ও ওয়াজ-নসীহত সত্ত্বেও তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্মে অটল থাকে। তারা এ কথা বলে হূদ আ. আমাদের দেবতাদের সমালোচনা করে, সে হেতু দেবতারা তাঁর কিছু ক্ষতি করেছে। এ বিষয়ে কুরআনুল কারীমে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ. اِنْ نَّقُوْلُ اِلاَّ اعْتَرٰكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ.

"আদ জাতির লোকেরা বললো, ওহে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ নিয়ে আসনি, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না, আর আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই। আমরা তো একথাই বলি, আমাদের দেব দেবীদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে। সে বললো, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, ঐ সকল দেব-দেবীর সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই তোমরা যাদের শরীক করছো।' (সূরা হূদ ঃ ৫৩-৫৪)

এ বিষয়ে আরও পরিষ্কারভাবে সূরা আল-আ'রাফ-এ হূদ জাতি ও হূদ আ.-এর মধ্যের বাক-বিতণ্ডার বর্ণনা এসেছে এভাবে ঃ

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ. قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوْٓا اٰلَاءَ اللّٰهِ

www.pathagar.com

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

"তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কুফরী করেছিল, বললো ঃ আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। সে বললো ঃ হে আমার জাতির লোকেরা, আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের রসূল, আমি তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের বিশ্বস্ত হিতাকাংখী। তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের মধ্য হতেই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে হেদায়েত এসেছে, যাতে তিনি তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন। তোমরা স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে নূহের জাতির পর তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি বেশী করেছেন। তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছো যে, আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করতো, তাদেরকে ছেড়ে দেই? অতএব নিয়ে এস আমাদের কাছে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও।' (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৬৬-৭০)।

হযরত হূদ আ. তাঁর কওমের লোকদের সন্দেহ দূর করার জন্য পরিষ্কার ভাষায় তাদেরকে বলেন, তোমরা এমন মনে করো না যে, আমি কোন পদ-পদবী অথবা সম্পদ ও প্রাচুর্যের লোভ-লালসায় এই সব কথা শিক্ষা দিচ্ছি। এমন নয় বরং আমি তো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত, কেবল আল্লাহর পয়গাম তোমাদেরকে শুনাই এবং কোন লোভ-লালসা ছাড়াই আমার উপর অর্পিত এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। তোমাদের নিকট হতে কোন কিছু প্রতিদান স্বরূপ চাই না। আমি তো কেবল আমার আল্লাহর নিকটই প্রতিদানের প্রত্যাশা করি।

হযরত হূদ আ.-এর জাতির প্রতি এই আহ্বানের পরও 'আদ জাতি প্রচণ্ডভাবে তাদের বিরোধিতা অব্যাহত রাখে এবং তারা হূদ আ.-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ঃ

قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ. اِنْ هٰذَا اِلاَّ خُلُقُ الاَوَّلِيْنَ. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ.

"তারা বললো, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ কিছু নয়। আমরা শাস্তি প্রাপ্ত হবো না।" (সূরা আশ-শু'আরা ঃ ১৩৬-১৩৮)

www.pathagar.com

'আদ জাতির অহংকারী লোকেরা বলতে থাকে, আপনি আমাদের আযাবের যে ভয় দেখান সেই আযাব নিয়ে আসুন। হূদ আ. বলেন, আযাব নিয়ে আসাতো কেবল আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো আল্লাহর দূত মাত্র। আমাকে যে পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আমি শুধু তাই পৌঁছিয়ে থাকি। হূদ আ.-এর এই আহ্বানের প্রত্যুত্তরে আদ-এর লোকেরা যা বলে, পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত ভাষায় তা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

قَالُوْآ اَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ. قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ.

'তারা বললো, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীর পূজা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছো? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে এসো। তিনি বললেন, এর জ্ঞান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয় সহ প্রেরিত হয়েছি, কেবল তাই তোমাদের নিকট পৌঁছাই। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়।" (সূরা আল-আহকাফ ঃ ২২-২৩)
হযরত হূদ আ.-এর জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বক্তব্য এভাবে এসেছে ঃ

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ.

'তারা বললো, হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন প্রমাণ পেশ করতে পারনি। আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না। এবং আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না।' (সূরা হূদ ঃ ৫৩)
হযরত হূদ আ. 'আদ-এর লোকদের উক্ত চরম কথার যে জবাব দেন তা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ - اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ.

'তিনি বললেন, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধতো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে; তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? এমন

www.pathagar.com

কিছু নাম সম্বন্ধে যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ সৃষ্টি করেছে এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন সনদ পাঠান নাই? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি ও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৭১)

আল্লাহর বিধি বিধান মেনে নেয়ার দাওয়াতী কার্যক্রমকে অস্বীকার করায় 'আদ জাতিকে অবশেষে আল্লাহ্ আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেন।

আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করায় 'আদ জাতির ধ্বংস

'আদ জাতির প্রতি অন্যায়-যুলুম ও নাফরমানী থেকে বিরত থেকে এক আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়া এবং কুফরী শিরকী তথা কল্পিত দেব-দেবীর পূজা পরিত্যাগ করে তৌহিদের প্রতি ঈমান আনয়ন ও সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনার জন্য হযরত হূদ আ.-এর দাওয়াতী কার্যক্রমকে অস্বীকার করায় রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি নেমে আসে চরম আযাব এবং অকৃতজ্ঞ, বিদ্রোহী, নাফরমান 'আদ জাতির অন্তিম সময় উপস্থিত হয়। প্রথমত 'আদ জাতি অনাবৃষ্টির শিকার হয় ফলে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের ফলে পর্যায়ক্রমে তাদের অহংকার ও দম্ভচূর্ণ হয়ে যায় ও তারা মারা যেতে থাকে। অতঃপর চূড়ান্ত পর্যায়ে নিকষ কালো অন্ধকার তুফান আরম্ভ হয়। সেই তুফান সাত রাত ও আটদিন ধরে চলতে থাকে এবং 'আদ জাতির সব কিছু ধ্বংস করে দেয়। সেই সব শক্তিধর ও মজবুত বাঁধনের মানুষগুলো, যারা নিজেদেরকে শক্তি ও সামর্থের অহংকারে চিৎকার দিয়ে বলতো ঃ (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) 'আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে?' এই গর্বিত ও অহংকারী জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের বাসগৃহসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যায়। বর্তমানে ঐ স্থানে বালির পাহাড় বা টিলা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

পবিত্র কুরআনে রসূলুল্লাহ স.-এর সমসাময়িক লোকদের নাফরমানী ও তাঁর দাওয়াতকে অস্বীকার করা আর বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনা অস্বীকার করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর আযাব-এর ইঙ্গিত দিয়ে বিশেষভাবে 'আদ জাতির ধ্বংসের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ সূরা আল-আহ্কাফে বলেন ঃ

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ. تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوَا لاَيُرَى اِلاَّمَسٰكِنُهُمْ - كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ. وَلَقَدْ

www.pathagar.com

مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا اِنْ مَكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةً فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ اَبْصَارُهُمْ فَ وَّلاَ اَفْءِدَ تُهُمْ مِّنْ شَىْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ.

'অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ-মালা আসতে দেখলো, তখন তারা বলতে লাগলো, 'এটাতো মেঘ, আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে।' হূদ আ. বললেন, 'এটাই তো তা, যার ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়ো করছিলে, এতে রয়েছে এক ভয়ানক ঝড়-মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ্ নির্দেশে তা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দিবে।' অতঃপর তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইলো না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে যে শক্তি সামর্থে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি। আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু এগুলো তাদের কোন কাজে আসেনি। কেননা, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তাই এদেরকে পরিবেষ্টন করলো।' (সূরা আহকাফ ঃ ২৪-২৬)।

হযরত হূদ আ. তার অনুসারীগণসহ ঐ ভয়াবহ ধ্বংসলীলা হতে আল্লাহর অনুগ্রহে রক্ষা পেলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ.

'আর যখন আমার নির্দেশ আসলো তখন আমি হূদ ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করলাম।' (সূরা হূদ ঃ ৫৮)

আল্লাহর যে আযাবে 'আদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَفِىْ عَادٍ اِذْاَ رْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ. مَاتَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ.

'আর (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) 'আদ জাতির ঘটনায়। আমরা যখন তাদের উপর এমন অকল্যাণময় বায়ু-প্রবাহ পাঠালাম তা যে জিনিসের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে তাকেই ছিন্ন ভিন্ন ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। (সূরা যারিয়াহ ঃ ৪১-৪২)।

'আদ জাতির ধ্বংসের আযাব কত ভয়াবহ ছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَ نُذُرِ. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ. تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ.

'আদ জাতি মিথ্যা সাব্যস্ত করে মারাত্মক অন্যায় করেছে, তাদের প্রতি আমার আযাবটা কত ভয়াবহ ছিল এবং আমার সতর্ক বাণী কত (কঠিন ছিল) তা লক্ষ্য কর। তাদের উপর আমি ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করেছিলাম; তা ছিল বিশাল আকারে ও ক্রমাগত অশুভ দিনে। তা লোকদেরকে উপরে উঠিয়ে এমনভাবে নিক্ষেপ করতে ছিল, যেন তারা মূল হতে উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড। (সূরা ক্বামার ঃ ১৮-২০)
'আদ জাতির ধ্বংসের বর্ণনা সূরা আল হাক্কায় এভাবে করা হয়েছে ঃ

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ - سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا - فَتَرَ الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعى - كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ.

'আর 'আদ সম্প্রদায় তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা, যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সপ্ত রাত্রি ও অষ্ট দিবস বিরামহীনভাবে। তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছ অতঃপর তাদের কাউকে তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি?' (সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৬-৮)
মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিধান অমান্যকারীদের এভাবেই যুগে যুগে ধ্বংস করে দিয়েছেন, আর আল্লাহর বিধান মান্য ও গ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ ভয়াবহ শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاَيَتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

'অতঃপর আমি তাঁকে (হূদ)ও তাঁর সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম; আর আমার বিধি-বিধানকে যারা অস্বীকার করেছিল এবং যারা মেনে নেয়নি তাদেরকে নির্মূল করেছিলাম।' (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৭২)
'আদ জাতির ধ্বংসের শাস্তি সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে অভিনব এক ঘটনার বিবরণ দেখা যায় আল্লামা ইব্‌ন কাছীর-এর বর্ণনায়। হযরত হূদ আ.-এর দাওয়াতকে অস্বীকার করে 'আদ জাতি যখন তাদের কুফরীর উপর অটল থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তিন বছর যাবৎ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ রাখেন। ফলে 'আদ জাতি দুর্ভিক্ষ কবলিত হয় এবং খাদ্যাভাবে তাদের মধ্যে হাহাকার শুরু হয়ে যায়। কা'বা

www.pathagar.com

শরীফ সে সময়ও দু'আ কবুলের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। 'আদ জাতি নেতা পর্যায়ের ৭০ জন লোকের একটি টিমকে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে কা'বা শরীফ পাঠায়। ঐ সময়ে মক্কায় আমালিকা সম্প্রদায়ের একটি পরিবার অবস্থান করছিল। তাদের সর্দার মু'য়াবিয়া ইব্‌ন বাকর-এর মাতা ছিল 'আদ সম্প্রদায়ের মেয়ে। আদ-এর প্রতিনিধি দলের লোকেরা এই আত্মীয়তার সুবাদে আমালিকা সর্দারের মেহমান হয়। তিনি তাদের ভালোভাবেই মেহমানদারী করেন। মদের সঙ্গে সঙ্গে দু'টি দাসী ও মনোর নের জন্য নিয়োজিত হয়। ফলে তারা যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা ভুলে গিয়ে আরাম-আয়েশ ও আনন্দ স্ফূর্তিতে মগ্ন হয়ে পড়ে।

অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মেজবানের মনে পড়ে যে, আদ প্রতিনিধি দলের নাফরমানীমূলক কার্যাবলীর কারণে যেন আবার তার গোত্রকে আল্লাহর গযবের শিকার হতে না হয়। কিন্তু তিনি মেহমানদেরকে ফিরে যেতে বলতে পারছিলেন না, পরিশেষে তিনি কতিপয় কবিতা রচনা করে দাসীদেরকে গাইবার জন্য বলেন। উক্ত কবিতায় 'আদ জাতির উপর আপতিত মুছিবতের কথা উল্লেখ ছিল। এই কবিতা শুনে 'আদ জাতির প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মক্কায় আগমনের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ হয়। অবশেষে তারা কা'বা শরীফে পৌঁছে এবং আল্লাহর নিকট 'আদ জাতির উপর আপতিত অনাবৃষ্টি দূর হওয়ার জন্য দু'আ করে। এই দু'আর ফলে আসমানে তিন রঙের মেঘ প্রকাশিত হয়, কালো, সাদা ও লাল। অতঃপর আসমান হতে আওয়াজ আসে যে, তোমরা তিন রঙের মেঘ থেকে যেকোন একটি রঙের মেঘকে নির্বাচন করে নাও। 'আদ জাতির মুখপাত্র কালো রঙের মেঘ পছন্দ করলো। কেননা তাদের ধারণা ছিল যে, কালো রঙের মেঘের মাঝে পানি বেশী ছিল। এরপর আসমান হতে পুনরায় আওয়াজ আসে যে, তোমরা ধ্বংসকারী মেঘকে পছন্দ করেছ; যা তোমাদের সব কিছুকে তছনছ করে দিবে।

অবশেষে এই কালো মেঘ 'আদ জাতির বসতির উপরে প্রেরণ করা হয়, যা আল্লাহর আযাব হিসেবে তাদের উপর আট দিন ও সাত রাত ধরে আযাবের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকে। 'আদ জাতির সমস্ত এলাকা ধ্বংস হয়ে দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহে কেবল হূদ আ. ও তাঁর অনুসারী মুমিনগণ ঐ আযাব থেকে রক্ষা পান। ঐ সময়ে তারা একটি ঘরে নিরাপদে বসেছিলেন।' (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর খ. ২, পৃ ২২৬)

আল্লাহর বিধান না মেনে তাঁর নাফরমানী করলে কিছু কাল আরাম আয়েশে কাটালেও অবশেষে আল্লাহর আযাবে এভাবেই তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত সালিহ আ.

মহান রব্বুল আলামীন সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর উপর ঈমানের দাওয়াত ও তাঁর হুকুমমত জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী ও রসূলদেরকে প্রেরণ

www.pathagar.com

করেছেন। মানব সভ্যতার প্রাথমিক যুগসমূহে আল্লাহর নাফরমান কাফেরদেকে দীনের দাওয়াত গ্রহণ ও তা মেনে চলার জন্য কিছু অবকাশ দান করে প্রকাশ্য বিদ্রোহ স্পষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ভয়াবহ আযাবের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। হযরত হূদের জাতি 'আদ সম্প্রদায়কে ঝড় তুফান দ্বারা ধ্বংস করার পর তাদের স্থলে ছামুদ জাতির নিকট হযরত সালিহকে প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে ছামদু জাতি সিরিয়া ও হেজাযের মধ্যবর্তী স্থান হতে কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে বসবাস করতো। হযরত ইবরাহীম আ.-এর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সময়েই তাদের সভ্যতার ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার নিদর্শনাদী লক্ষণীয়-তারা অধিক দীর্ঘকাল জীবিত থাকতো, যার কারণে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করতে বাধ্য হতো।

ছামুদ সম্প্রদায় তাদের পূর্ব পুরুষদের ন্যায় মূর্তি পূজা করতো। এক আল্লাহর পরিচয় ভুলে তারা চরম নাফরমানীমূলক শিরকী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করতে থাকে। তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলা হযরত সালিহ আ.-কে রসূল হিসেবে প্রেরণ করেন। সৃষ্টি জগতের সকল বস্তুই আল্লাহর তাওহীদের প্রমাণ বহন করে, এই কথা তিনি তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেন এবং প্রতিমা পূজার অসারতা তাদের সামনে তুলে ধরেন। (আঃ ওহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৯)

হযরত সালিহ আ.-কে যখন নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয় তখন তিনি যুবক ছিলেন। তার নবুওয়ত লাভ ও হূদ আ.-এর ইনতেকালের মধ্যে ব্যবধান ছিল একশত বছরের মত। এ সময় ছামুদ সম্প্রদায়ের অধিপতি ছিল জুনদা ইব্‌ন আমর। (আল-মাসুদী, মুরূজুয যাহাব। (প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩)

হযরত সালিহ আ. ছামুদ জাতির লোকদেরকে সর্বশক্তিমান লা শরীক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করলেন। তাঁর আহ্বানে সামান্য কিছু লোক সাড়া দিল। আর অধিকাংশ লোক তা গ্রহণ করলো না। তারা তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রুপ ও গালমন্দ করলো, তিনি তাঁর দাওয়াতী কাজে বিরত না হওয়ায় জাতির পক্ষ থেকে যুলুম-নির্যাতন এমন কি হত্যার হুমকীর শিকার হন। তারা তাঁর উষ্ট্রী হত্যা করলো। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দিলেন। (ইবন কাছীর, আল-বেদায়া ওয়ান নিহায়া, বৈরূত ১৯৮৮ খৃ. খ. ৩১, পৃ. ১২৩)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا – قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ – قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ – هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ

www.pathagar.com

خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّأَكُمْ فِى الاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا. فَاذْكُرُوْآ الاَءَ اللّٰهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ. قَالَ الْمَلاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِه لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ امَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّه قَالُوْآ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِه مُؤْمِنُوْنَ. قَالَ الَّذِيْنَ سكْبَرُوْآ اِنَّا بِالَّذِىْ امَنْتُمْ بِه كفِرُوْنَ.فَعَقَرُوْا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يصلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جثِمِيْنَ. فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لاَّ تُحِبُّوْنَ النّصِحِيْنَ.

'আমি ছামুদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা ছালেহকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহর এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর জমিনে চড়ে খেতে দাও এবং একে কোন-কষ্ট দিও না। একে কোন কষ্ট দিলে ভয়ানক শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। স্মরণ কর, 'আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সংঘটিত করো না। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা সেই সম্প্রদায়ের ঈমানদার, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তাদেরকে বললো, তোমরা কি জান যে, সালিহ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত? তারা বললো, তাঁর প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী। দাম্ভিকেরা বললো, তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রীটি বধ করে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং বলে, হে সালিহ! তুমি রসূল হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর। অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাদের প্রভাত হলো নিজ গৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়। তৎপর সে তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌছিয়ে ছিলাম এবং তোমাদের হিতোপদেশ

www.pathagar.com

দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা তো হিতাকাঙ্খীদেরকে পছন্দ কর না।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৭৩-৭৯)

'আদ জাতির ন্যায় ছামুদ জাতিও মহান রব্বুল আলামীনের বিধানকে মেনে নিয়ে তাদের জীবন পরিচালনা করতে অস্বীকার করলো। ছামুদ জাতিকে হেদায়াত ও সরল সঠিক পথে পরিচালনার জন্য হযরত সালিহ্ আ. দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেও তাদেরকে হেদায়েত গ্রহণ করাতে পারেননি। ছামুদ জাতির লোকেরা সালিহ আ.-কে বিশ্বাসই করলো না বরং তারা চ্যালেঞ্জ করে বললো যে, আমরা অন্যায় করলে আমাদের উপর শাস্তি আসতো। অবশেষে আল্লাহর আযাবে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

ছামুদ জাতির হেদায়াত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা হূদে বলেন ঃ

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ - هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْآ اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ - قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ - قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ - وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ. فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ - ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ - فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ- وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ. كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدً لِّثَمُوْدَ.

'আমি ছামুদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠিয়ে ছিলাম। সে বলেছিল হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং মাটিতে বসবাস করাচ্ছেন। সুতরাং তোমরা তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটে, তিনি

www.pathagar.com

বান্দাহর আহ্বানে সাড়া দেন। তারা বললো, হে সালিহ! এর পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশার স্থল। তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছো ইবাদত করতে তাদের যাদের ইবাদত করতো আমাদের পিতৃ পুরুষেরা? আমরা অবশ্যই সে বিষয় বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করছো। সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবে দেখছো, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, তবে আল্লাহর শাস্তি হতে আমাকে কে রক্ষা করবে, আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি? সুতরাং তোমরাতো কেবল আমার ক্ষতিই বাড়িয়ে দিচ্ছ। হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর এই উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর জমিনে চরে খেতে দাও। একে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে আশু শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। কিন্তু তারা এটাকে বধ করলো। অতঃপর সে বললো, তোমরা তোমাদের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও। এটা এমন একটি প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবার নয় এবং যখন আমার নির্দেশ আসলো তখন আমি সালিহ ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা করলাম সেই দিনের লাঞ্ছনা হতে। তোমার প্রতিপালক তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী। অতঃপর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করলো। ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। যেন তারা সেথায় কখনও বসবাস করেনি। জেনে রাখ, ছামুদ সম্প্রদায় তো তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রাখ ধ্বংসই হলো ছামুদ সম্প্রদায়ের নাফরমানির পরিণাম। (সূরা হূদ ঃ ৬১-৬৮)

মহান রব্বুল 'আলামীন মানবজাতিকে শুধুমাত্র তাঁরই হুকুম বিধান মেনে জীবন যাপনের জন্য সৃষ্টি করেছেন, ইতোপূর্বে 'আদ সম্প্রদায় যেভাবে আল্লাহকে মেনে নিয়ে তাঁর বিধান অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যায় তেমনি ছামুদ জাতি ও মহান আল্লাহর বিধানকে না মানায় ও আল্লাহর নিদর্শনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে উষ্ট্রীকে হত্যা করার কারণে ভয়াবহ আযাবে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদেরকে যে ধরনের শাস্তি দেয়া হয় সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ .

'আমরা তাদের উপর শুধু একটি মাত্র ধ্বনি ছেড়েছি, ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীদের নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ডাল-পালার মতই ভূষি হয়ে গেল।' সূরা কামার ঃ ৩১ এখানে তাদের ওপর আপতিত আযাবে পিষ্ট, জীর্ণ লাশগুলোকে পশুর পদদলিত ভূষির সাথে তুলনা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

ছামুদ জাতির ওপর শাস্তির ধরন

পবিত্র কুরআনে ছামুদ জাতির ওপর আপতিত আযাবের ধরন সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীর রচয়িতা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ আব্দুল ওয়াহাব আন-নাজ্জার বলেন, ছামুদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল (صَاعِقَةٌ) বজ্রাঘাতের দ্বারা। এই বজ্রাঘাত বুঝাতে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে কোন সময় (اَلرَّجْفَةُ) রাজফা, কোন সময় (الطَّاغِيَةُ।) ত্বাগীয়া এবং কোন সময় (الصَّاعِقَةُ।) আস- স'ইকা বলে উল্লেখ করেছেন। বজ্রাঘাত কোন সময় ভয়ংকর শব্দের সাথে সংঘটিত হয়, কোন সময় ভূমিকম্পের সাথে আবার কোন সময় এক স্থানে পতিত হয়ে অন্য স্থানে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।(আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৬৬) আল-আলূসী লিখেছেন فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ আয়াতে উল্লেখিত رَجْفَةٌ সম্পর্কে আল-ফাররা বলেন, এর অর্থ হলো ভয়ানক ভূমিকম্প। মুজাহিদ ও আস-সুদ্দী বলেন, رَجْفَةٌ শব্দের দ্বারা صَيْحَةٌ বা বিকট শব্দই বুঝানো হয়েছে। এ দুটি অভিমতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে বলা যায় যে, সম্ভবত উক্ত সম্প্রদায়ের উপর নিম্নদিক হতে ভূমিকম্প এবং উপর দিক হতে বিকট ধ্বনি আপতিত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন যে, رَجْفَةٌ হলো কম্পমান হৃদয় এবং তার অস্থিরতা, যার ফলে অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আল-আলূসী আরও বলেন, পবিত্র কুরআনের কোন স্থানে رَجْفَةٌ, কোন স্থানে صَيْحَةٌ আর কোন স্থানে طَاغِيَةٌ ব্যবহারে কোন বিরোধ নেই। (রূহুল মা'আনী, খ. ৮ পৃ. ১৬৬৫)। আল্লামা বাগাবী বলেন, যে বিকট শব্দের মাধ্যমে ছামুদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছিল তা ছিল জিবরাঈল আ. কর্তৃক প্রদত্ত। ফলে তারা সকলেই মারা গিয়েছিল। আর কেউ কেউ বলেন, তাদের উপর আকাশ হতে আপতিত ধ্বনির সাথে ভূমন্ডলের ধ্বনির মিশ্রণ ঘটে ছিল। ফলে তাদের হৃদপিন্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। (আলবাগাবী, তাফসীর খ. ২, পৃ. ৩৯১)

আত-তাবাতাঈ বলেন, ছামুদ জাতির উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার বিষয়টি ধার্য হলে সেদিন অর্ধরাত্রি শেষে তাদের নিকট জিবরাঈল আ. আগমন করে তাদের উদ্দেশ্যে এমন এক বিকট আওয়াযে চিৎকার দেন যার ফলে তাদের কান ফেটে যায় ও হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে পড়ে। তারা সেই তিন দিন কাফনসহ অন্যান্য মৃত সামগ্রী নিয়ে প্রস্তুত ছিল যে, তাদের উপর আযাব নাযিল হবে। জিবরাঈল আ.-এর ধ্বনি শুনে মুহূর্তের মধ্যে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। ছোট-বড় কেউই মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা পায়নি। তাদের পাখিদের কোন কল-কাকলী ছিল না, না ছিল কোন রাখাল ছেলের পশু হাঁকানোর ধ্বনি। পশু পাখিসহ সকল বস্তু নিমিষেই

www.pathagar.com

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা উক্ত আযাবের সাথে আগুনও প্রেরণ করেছিলেন ফলে তারা ভস্মিভূত হয়েছিল।

হযরত সালিহ্ আ.-এর দাওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার কাজ

ওয়াহহাব ইবন মুনাব্বিহ র. হতে আবুশ-শায়খ বর্ণনা করেন, সালিহ আ. ও তার উপর ঈমানদারগণ আল্লাহর আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভ করবার পর মক্কা শরীফে চলে আসেন, তৎপর এখানেই মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর দীনের হুকুম আহকাম কার্যকরী করার দাওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করেন। প্রাচীন কালের কা'বা গৃহের পশ্চিম পার্শ্বে যে সকল কবর ছিল সেগুলো ছামূদ জাতি লোকদের। (আলূসী, রূহুল মা'আনী, খ. ৮, পৃ. ১৬৮)।

বাগাবী বলেন, সালিহ্ আ.-এর জাতির মুমিনদের সংখ্যা ছিল চার হাজার, তিনি আটান্ন বছর বয়সে মক্কা শরীফে ইনতেকাল করেন। (আল-বাগাবী, তাফসীর, খ. ২, প. ১৭৯)

ইবনুল আছীর বলেন, সালিহ্ আ. সিরীয়ায় চলে গিয়ে ফিলিস্তিনে অবস্থান করতে ছিলেন, পরে তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে মক্কায় চলে আসেন ও তাদের মাঝে বিশ বছর পর্যন্ত দীনের দাওয়াত চালিয়েছিলেন। (ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত ১৯৮৭ খৃ. খ. ১, পৃ. ৭১)

আবদুর রহমান ইব্ন ছাবিত হতে ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেছেন, কা'বা প্রান্তরে রুকনুল য়ামানী, মাকামে ইবরাহীম ও যমযমের মধ্যবর্তী স্থানে উনাশি জন নবীর কবর রয়েছে, তাঁদের মধ্যে নূহ্, শু'আইব, সালিহ্ ও ইসমাঈল আ. রয়েছেন। সালিহ্ আ.-কে তাঁর যৌবনে নবী করে তার জাতির নিকট পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাঁর কওমকে দাওয়াত দিতে দিতে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। (রূহুল মা'আনী, খ. ৮, পৃ. ১৬১-১৬২)

ছামূদ জাতির মাঝে হযরত সালিহ্ আ. মহান আল্লাহর দীনের দাওয়াতী কাজ করেন, অবশেষে অস্বীকারকারীগণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর মুমিনদেরকে তিনি আল্লাহর বিধান মোতাবেক পরিচালনা করেন। অবশেষে মক্কায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ১৮, পৃষ্ঠা ঃ ১২৩-১২৫

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মতামত

ইসলামী আইন ও শরীয়া সম্পর্কে অপপ্রচার প্রতিরোধ করতে হলে সকল প্রচার মাধ্যমে ইসলামের ইতিবাচক প্রচারণা জোরদার করতে হবে

॥ আইন ও বিচার প্রতিবেদন ॥

১৪ মার্চ ২০০৯ শনিবার, 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ'-এর দফতরে 'ইসলামী আইন ও শরীয়াহ্ সম্পর্কে অপপ্রচার ঃ আমাদের করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের খ্যাতিমান ও বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, আইনবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, আলেম ও কলামিস্ট উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। আলোচনা করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবদুল মা'বুদ, সংস্থার রিসার্চ পরিচালক আবদুল মান্নান তালিব, ডা. আবদুল কাইয়ুম, ব্যারিস্টার বেলায়েত হোসাইন, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিকী, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, এ. আর, এম. আবদুল মতিন, মকবুল আহমাদ, শিল্পপতি মুহাম্মদ ইবরাহীম, অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান, সাংবাদিক ফারুক আহমদ প্রমুখ। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট কলামিস্ট উবায়দুর রহমান খান নাদভী।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় রিসার্চ পরিচালক আবদুল মান্নান তালিব বলেন, আমাদের সমাজে ইসলামের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করার জন্যে একদল লোক সৃষ্টি হয়েছে। জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করতে তারা অনাগ্রহী। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তারা ইসলামী অনুশাসনকে প্রতিরোধ করতেও তৎপর।

এই সুযোগে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীরা ইসলামকে শরীয়ত থেকে আলাদা করে ইসলামকে নিছক একটি আনুষ্ঠানিক ধর্মে পরিণত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তারা যদি সফল হয় তাহলে ধর্মহীনতা ভয়ংকর বিভীষিকার রূপধারণ করবে। আল্লাহ্র শাসন থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ প্রবৃত্তির অপশাসন ও রকমারী স্বৈরাচারী শাসনে বন্দি হয়ে যাবে। পাশ্চাত্যে রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা করার কারণে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামী আইন ও শরীয়াকে আলাদা করার দাবি করে বলা হচ্ছে, ইসলামের জন্যে শরীয়া আইনের প্রয়োজন নেই। ধর্ম হিসেবে আমরা ইসলাম মেনে চলবো, আর আমাদের আইন আমরা নিজেরা তৈরি করে নেবো- কুরআন ও

www.pathagar.com

সুন্নাহর ভিত্তিতে এই ভ্রান্ত চিন্তা ও অপচেষ্টা যথাযথ পর্যালোচনা করে এর গলদগুলো তুলে ধরা উলামা ও মুসলিম স্কলারদের কাছে সময়ের অপরিহার্য দাবি।

সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, এদেশের কোন আলেম, ইমাম, মুসল্লী সন্ত্রাসী নয়। কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি সন্ত্রাস করে না। অপরাধের তালিকায় কোন ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ নেই। ধর্মনিষ্ঠ মানুষের সংখ্যাই এদেশে বেশী কিন্তু যে ইসলামের রয়েছে সুস্থ সুন্দর সুশৃঙ্খল অপরাধহীন সমাজ নির্মাণের সর্বজনীন আইন যে আইন সমাজকে অপরাধ মুক্ত করতে পারে সেই ইসলামী আইনের ব্যাপারে এদেশের অধিকাংশ মুসলমানের স্বচ্ছ ধারণা নেই। ইসলামী আইন প্রয়োগের ব্যাপারে তারা প্রভাবহীন। এদেশের লাখ লাখ

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন রিসার্চ পরিচালক আবদুল মান্নান তালিব

আলেম, ইমাম, খতীব ও ইসলামী আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেন না, ফলে এদেশে ইসলামী আইন ও শরীয়া বিরোধী প্রচারণা দিন দিন প্রবল হচ্ছে। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তি শিকার হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য করণীয় সম্পর্কে দেশের ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের সুচিন্তিত মতামত সময়ের অপরিহার্য দাবি। এই সংস্থা সকল অভিজ্ঞ জনের কাছে বস্তুনিষ্ঠ মতামত প্রত্যাশা করে।

উপস্থিত বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ যেসব কর্ম-কৌশল গ্রহণের সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছেন সেগুলোর মূল কথা হলো–

www.pathagar.com

ক. সকল প্রচার ও গণমাধ্যমগুলোতে ইসলাম বিদ্বেষী ও চক্রান্তকারীদের নেতিবাচক প্রচারণার বিপরীতে ইসলামপন্থীদের ইতিবাচক প্রচারণা জোরদার করতে হবে।

খ. ইসলামী আইন ও পাশ্চাত্য আইন সম্পর্কে একদল অভিজ্ঞ যোগ্য লোক তৈরি করতে প্রয়োজনীয় একাডেমিক ব্যবস্থা এবং ফাইনান্সিয়াল সাপোর্টিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. আধুনিক সকল উপকরণ প্রযুক্তি ও মাধ্যমকে ইসলামের পক্ষে ব্যবহার ও প্রয়োগ করার যোগ্যতা মুসলিম স্কলারদের অর্জন করতে হবে।

ঘ. প্রচার মাধ্যমের সবগুলোতেই মুসলিম স্কলারদের জোরদার অবস্থান নিশ্চিত করার কার্যকর কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

সমাপনী বক্তব্য দিচ্ছেন সভাপতি শাহ আব্দুল হান্নান

ঙ. নারীকে দাওয়াতী কাজের সকল ক্ষেত্রেই যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। নারী সম্পর্কে ইসলাম বিরোধীদের অসত্য প্রচারের জবাব দিতে যোগ্যতা সম্পন্ন নারী ব্যক্তিত্বের শূন্যতা দূর করতে হবে।

চ. ছোট খাটো মত পার্থক্য পরিহার করে মুসলিম উম্মাহ ও জাতীয় স্বার্থে সকল মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য সংহত করতে হবে।

ছ. গবেষণামূলক কর্ম ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে মত পার্থক্যের উর্ধ্বে রেখে এগিয়ে নিতে হবে।

জ. এই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার জন্যে সবার সহযোগিতা করতে হবে।

– আবুশিফা মুহাম্মদ শহীদ

www.pathagar.com

REGD. NO. DA. 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : April-June : 2009. TK. 40